

ओ३म्

आर्ष-जेर्याति

बांग्लादेश अग्निवीर द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक अनलाइन पत्रिका



श्री रामनवमी
विशेष संख्या

१९९ दयानन्दाब्द, २०८० विक्रमाब्द, १४२९
वङ्गाब्द (माघ-चैत्र), २०२० इंग्रेजि (जानुवारी-मार्च)

সূচিপত্র

1. সম্পাদকীয়	03
2. রামায়ণে বৈদিক ন্যায় এবং দণ্ডব্যবস্থা	05
3. বাল্মীকি রামায়ণে রাম-রাজ্যের মহিমা	12
4. বীর হনুমান আর্য রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন.....	16
5. শ্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র দেহলবী	26
6. মৃত্যুর সময় কে সঙ্গী/সহায়ক হবে?	41
7. What is the importance of Manusmriti in Vedic tradition?	42
8. সামবেদের আলোকে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য	44
9. চরণ স্পর্শ প্রণাম ও পাদপ্রক্ষালন মীমাংসা	46
10. ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে পরীক্ষাপূর্বক বিবাহ করা উচিত কি না ?.....	48
11. যজ্ঞের সমিধা কেন ৮ আঙুল হয় ?	49
12. মধুসূদন গুপ্ত - প্রথম ভারতীয় সনাতনী শব ব্যবচ্ছেদকারী	52
13. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্যসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা বলেছেন.....	56
14. স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন.....	58
15. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর বঙ্গে দিনগুলো যেমন ছিলো.....	63
16. ষোড়শ সংস্কার পরিচয় ও মানবজীবনে তাৎপর্য	69
17. পঞ্চমহাযজ্ঞ কী ও কিভাবে করা হয় ?	72
18. ঋষি কে ?	77
19. ভজন, কীর্তন ও স্তোত্র বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান হিসেবে গীত করার বৈদিক নির্দেশনা আছে কি ?.....	78
20. আর্য সমাচার	80
21. অথর্ববেদ রহস্য দশ মাথার ব্রাহ্মণ কে ?	86
22. গর্ভে বাছুর নিয়ে গাভী উড়ে কোথায় ও কেন যাচ্ছে? অর্ধপথে ফিরে আসে কেন?.....	87
23. পাই এর মান নির্ণয়ে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের অবদান	89
24. প্রকৃত শিবের সন্ধান	93
25. স্বাধ্যায় চতুর্থ ব্যাচের ফলাফল	95

সম্পাদকীয়

ও৩ম্

নমস্কার। বাংলাদেশ অগ্নিবীরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'আর্ষ জ্যোতি'র বিশেষ তথা ২য় সংখ্যা "রামানবমী সংখ্যা" পরমকরুণাময়ের কৃপায় প্রকাশিত হলো। শ্রীরামানবমীর প্রাক্কালে রামায়ণ সম্পর্কিত নিবন্ধ এই সংখ্যার শুরুতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি রামায়ণের বিশেষ শিক্ষা আকর্ষণীয় চিত্ররূপেও অন্তর্জালে প্রকাশিত হয়েছে।

বসন্তপঞ্চমীর সমাপনে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর জয়ন্তী ও আর্ষসমাজের স্থাপনা দিবস মহাসমারোহে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি ও শ্রী অমিত শাহ্ দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছে। আমরা তাদের হৃদয়ের উদগার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা রাখি।

পাশাপাশি এই সংখ্যায় বেদ, আর্ষ পরম্পরায় বৈদিক শাস্ত্র অ শঙ্কাসমাধান প্রস্তুত করা হয়েছে। সংযুক্ত করা হয়েছে ' স্বাধ্যায় ' আয়োজনের ৪র্থ ব্যাচের বিজয়ীদের নামও। উল্লেখ্য প্রতিটি শাখায় অনুষ্ঠিত ' স্বাধ্যায় চক্র ' চিত্র আকারে প্রদান করা হয়েছে উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্তে।

সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর পত্রিকা নির্মাণে সহায়ক সকলকে ও পাঠককে কৃপাধন্য করুন।

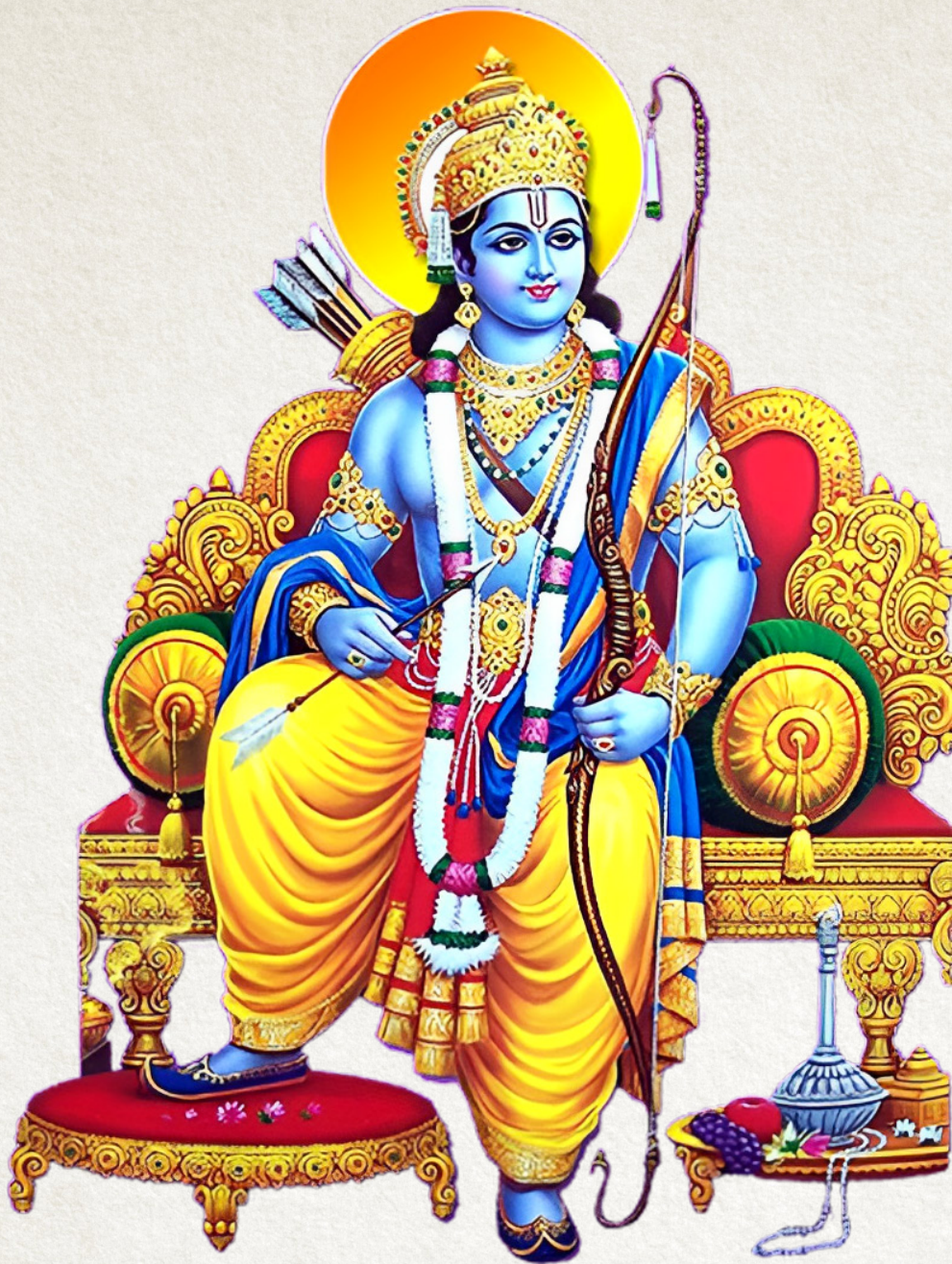
শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ
শিক্ষা ও শাস্ত্রার্থ সমন্বয়ক
বাংলাদেশ অগ্নিবীর
dipangkar.agniveeroofficial@gmail.com

প্রকাশক: স্বাধ্যায় প্রকাশনী
© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া যেকোনো মাধ্যমে
বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ নিষিদ্ধ

প্রচ্ছদঃ শ্রী সুব্রত দেবনাথ
Pdf নির্মাণেঃ শ্রী বঙ্কন বিশ্বাস

মূল্যঃ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য



শ্রীরামচন্দ্র ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজা-কল্যাণব্রতী, যশস্বী জ্ঞানী, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় এবং
যোগসমাধিমান পুরুষ।

[বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড ১/১২]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব
মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি তথা

শ্রীরাম নবমীর শুভেচ্ছা

শুভেচ্ছান্তে-বাংলাদেশ অগ্নিবীর পরিবার



রামায়ণে বৈদিক ন্যায় এবং দণ্ডব্যবস্থা

শ্রী সৈকত দাস

য়াবৎ স্হাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ তাবদ্ মহীতলে ।

তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিয়্যতি ॥

(আদিকাণ্ড: ২/৩৬)

অনুবাদঃ যতকাল এই পৃথিবীতে পর্বতসমূহ ও নদীসমূহ থাকবে ততকাল এই সংসারে (পৃথিবীতে) রামায়ণ কথা প্রচারিত থাকবে ।

লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় দিব্য রাম কথার শ্রোতস্বিনী প্রবাহিত করে কোটি-কোটি হৃদয়ে অমৃতত্ব প্রদানকারী মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সকলের বন্দনীয় । সংস্কৃতি, সভ্যতা, দর্শন, শিক্ষা, রাজনীতি আদি বিবিধ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি মনোহারী চিত্রণ করেছেন । আর্যাবর্তে আজও কোটি-কোটি ধর্মপ্রাণ রামভক্তগণ রামায়ণে বর্ণিত অমৃতময় রামরাজ্যের কামনা করেন ।

প্রাচীনকালে রাজনীতি শব্দের প্রয়োগ তথা প্রচলন ছিলো না, সর্বত্র রাজধর্ম শব্দেরই প্রয়োগ তথা প্রচলন ছিলো । রাজধর্মে ন্যায় এবং দণ্ড-ব্যবস্থা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হতো । সভ্যতার বিকাশের সাথে সমাজে ন্যায় এবং দণ্ড-ব্যবস্থারও বিকাশ হয়েছে ।

প্রাচীনকাল থেকেই রাজাকে ধর্ম এবং নিয়মের সংরক্ষণ হিসেবে মানা হয় এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাকে দণ্ড প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে । মহর্ষি মনু অনুসারে প্রজাপতি প্রজাগণের রক্ষা হেতু রাজার সৃষ্টি এবং তার সহায়তার জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন । রামায়ণ কালীন আর্যাবর্তেও ন্যায় এবং দণ্ড-ব্যবস্থা সমুচিত রূপে প্রয়োগ করা-ই রাজার প্রমুখ কর্তব্য তথা পারলৌকিক সমৃদ্ধির সাধন হিসেবে মান্যতা দেওয়া হতো ।

প্রমাণ-

অপরাধিযু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু বৈ ।

স দণ্ডো বিধিবন্মুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্থিব ॥

(উত্তরকাণ্ড: ৭৯/৯)

অনুবাদঃ অপরাধী মানুষদের ওপর যে দণ্ড প্রয়োগ করা হয়, সেই বিধিপূর্বক প্রদত্ত দণ্ড রাজাকে স্বর্গলোকে পৌঁছে দেয় ।

অতঃ নিষ্পক্ষ ন্যায়ের প্রয়োগ তথা দণ্ড প্রদান করা রাজার প্রমুখ কার্য । রাজাকেই ন্যায়ের স্রোত হিসেবে মান্যতা দেওয়া হতো এবং প্রারম্ভিক তথা অন্তিম ন্যায়ালয় প্রজাগণের জন্য রাজাই ছিলেন ।

স্মৃতি বলে রাজা একা ন্যায় প্রয়োগ করতে পারবে না । তার প্রজাগণের সহায়তায় ন্যায় প্রয়োগ করা উচিত । মনু এবং যাঙ্গবক্ষ্য স্মৃতির অনুসারে রাজার কর্তব্য বিনা আড়ম্বরপূর্ণ বস্ত্র পরিধান কারী বিদ্বান, ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রিগণের সহিত ন্যায়কক্ষে প্রবেশ করা উচিত তথা তাকে ক্রোধপূর্ণ মনোভাব এবং লোভ-লালসা পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত নীতিমালার অনুযায়ী ন্যায় প্রয়োগ করা উচিত রামায়ণ কালেও উপর্যুক্ত মান্যতার প্রয়োগ হতো সর্বত্র এবং শাস্ত্র সম্মত নীতি অনুসারে অপরাধীকে দণ্ড প্রদাষ করা হতো । কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ভগবান শ্রীরাম বালীকে বলেছিলেন-

আর্যেণ মম মান্ধাতা ব্যসনং ঘোরমীক্ষিতম্ ।

শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া ॥

(কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড. ১৮/ ৩৬)

অনুবাদঃ প্রাচীনকালে আপনার ন্যায় অপরাধ করেছিলেন জনৈক শ্রমণ । আমার পূর্বপুরুষ মান্ধাতাও তাঁর প্রতি কঠোর শাস্তিবিধান করেছিলেন ।

অন্য বিবিধ স্থলেও পরম্পরায় রাজা দ্বারা স্থাপিত রাজধর্ম অনুসারে ন্যায় শাসন প্রয়োগের উল্লেখ রামায়ণে উপলব্ধ । সেই সময়কালে যদি উচ্চ জ্ঞানী কোনো ব্যক্তিও নির্বোধ হয়ে, কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান হারিয়ে কুমার্গে গমন করতো তা তাকে ন্যায় সঙ্গত দণ্ড প্রদানের আবশ্যিকতা ছিলো । এই বিষয়ের স্পষ্ট সংকেত ভরতের প্রতি শত্রুঘ্ন'র প্রয়োগকৃত বচন দ্বারা স্পষ্ট পরিলক্ষিত, যখন রাজা দশরথ এক নারীতে বশীভূত হয়ে কুমার্গে আরুঢ় হয়ে গিয়েছিলেন তখন ন্যায় এবং অন্যায়ের উপর বিচার করে তাঁকে প্রথমেই দণ্ড প্রদান করা আবশ্যিক ছিলো । সহায়ক রূপেও রাজা যোগ্য ন্যায়াধীশগণ দ্বারা সুস্পষ্ট বিচার ব্যতীত বিনা অভিযুক্তকে দণ্ড প্রদানের অনুমতি ছিলো না, কেননা সমাজে এই প্রথার প্রচলন ছিলো যে, নিরপরাধ হওয়ার পরও যাদের উপর মিথ্যা দোষ আরোপ করে দণ্ড দেওয়া হতো, সেই নিরপরাধের অশ্রুধারা পক্ষপাত পূর্ণ শাসনকর্তা রাজার পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য আদিল বিনাশের কারণ হতো । রাজার কর্তব্য ছিলো, ভ্রষ্ট ন্যায়াধীশ বা অন্য কোনোরূপ কারণে কুমার্গে গমনকারী কোনো অপরাধী ব্যক্তি ন্যায়ের হাত থেকে যেনো রক্ষা না পায় । অসহায় দরিদ্র এবং সাধন সম্পন্ন ধনী এই দুই শ্রেণীর মাঝে নিষ্পক্ষ হিসেবে অবস্থান করাই রাজারই কর্তব্য ছিলো ।

এ বিষয়ে রামায়ণ হতে কিছু প্রমাণ -

তাং সত্যনামাং দৃঢ়তোরণার্গলাং গৃহৈর্বিচিট্রৈরুপশোভিতাং শিবাম্ ।

পুরীময়োধ্যাং নৃসহস্রসংকুলাং শশাস বৈ শত্রুসমো মহীপতিঃ ॥

(আদিকাণ্ড: ৬/২৮)

অনুবাদঃ 'ইন্দ্রের ন্যায় [মহাতেজস্বী] মহাবাজ দশরথ, বিচিত্র বর্ণময় গৃহশোভিত সহস্র সহস্র নরনারী পরিপূর্ণ দৃঢ় অর্গলবদ্ধ তোরণযুক্ত কল্যাণময়ী সার্থকনাম অযোধ্যাপুরীকে পালন করতেন ।

বলবান্ বীর্যসম্পন্নো লক্ষ্মণো নাম যোঃ প্যসৌ ।

কিং ন মোচয়তে রামং কৃত্বাপি পিতৃনিগ্রহম্ ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড. ৭৮/৩)

অনুবাদঃ যে বলশালী লক্ষ্মণ বীর্যবান বলে সুপরিচিত, তিনি পিতাকে নিগৃহীত করেও কেন রামকে বনগমন থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না ?

পূর্বমেব তু বিগ্রাহ্যঃ সমবেক্ষ্য নয়ানযৌ ।
উৎপথং যঃ সমারুঢ়ো নার্যা রাজা বশং গতঃ ॥
(অযোধ্যাকাণ্ড. ৭৮/৪)

অনুবাদঃ রাজা যে এক নারীর বশীভূত হয়ে বিপথে চালিত হয়েছেন, পূর্বেই ন্যায়-অন্যায় সম্যক্রূপে বিচারপূর্বক রাজাকে (বিপথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য) নিগৃহীত করা উচিত ছিল।

কচ্চিদার্যোঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চাপকর্মণা ।
অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ ॥ ৫৬
গৃহীতশ্চৈব পৃষ্ঠশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্থভ ॥ ৫৭
বাসনে কচ্চিদাঢ্যস্য দুর্বলস্য চ রাঘব ।
অর্থং বিরাগাঃ পশ্যন্তি তবামাত্যা বহুশ্চতাঃ ॥ ৫৮
য়ানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রুণি রাঘব ।
তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ ॥ ৫৯

(অযোধ্যাকাণ্ড: ১০০/ ৫৬ - ৫৯)

অনুবাদঃ কোনও শুদ্ধচিত্ত সজ্জন মিথ্যা অপবাদে দোষী সাব্যস্ত হলে, কোনও বিচারশাস্ত্রকুশল সজ্জন দ্বারা তাঁর দোষ অপ্রমাণিত হলেও লোভবশত তাঁর দণ্ডবিধান করো না তো? ‘হে নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি চুরি করার সময় ধরা পড়েছে, (জিজ্ঞাসার উত্তরে চুরির কথা) স্বীকারও করেছে, এমনকী তাকে চুরি করতে দেখা গেছে—অর্থের বিনিময়ে উৎকোচ গ্রহণ করে এমন চোরকে চুরির দায় থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় না তো! (উৎকোচগ্রাহী এমন অসাধু কর্মচারী তোমার রাজ্যে নেই তো)! ‘হে রঘুকুলভূষণ! শক্তিমান ধনী ও দুর্বল দরিদ্রের মধ্যে বিবাদের বিচারে তোমার সুবিদ্বান অমাত্যগণ (বিচারকগণ) অর্থলোভ ত্যাগ করে নিরপেক্ষ বিচার করেন তো? হে রাঘব! আত্মপ্রীতির জন্য নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা অভিযুক্তের প্রতি শাসনহেতু উক্ত অভিযুক্তের অশ্রুধারা ওই শাসকের সন্তান ও পালিত পশুকে ধ্বংস করে।

তৎকালীন সমাজে রাজার প্রধান কর্তব্য ছিলো, তিনি এমন নীতির ব্যবস্থা করুক যেনো সর্বপ্রকার অভিযোগকারীর প্রত্যেকেই ন্যায়ালায়ে সুবিচার পেতে পারে। ভগবান শ্রীরামের শাসনকালে এরূপ সুব্যবস্থা ছিলো যে, প্রজাগণ সর্বদা নিষ্পক্ষ এবং তাৎকালিক ন্যায় প্রাপ্ত হতো।

সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥
(যুদ্ধকাণ্ড. ১২৮/১০০)

অনুবাদঃ সকলে সদা আনন্দে থাকত এবং ধর্মাচরণ করত। শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে একে অন্যকে হিংসা করত না।

দৃশ্যতে ন চ কার্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি ।

(উত্তরকাণ্ড. ৫৯ /(১) /১০)

অনুবাদঃ শ্রীরামের শাসনকালে দরবারে কখনও কোনো অভিযোগকারী ছিল না ।

পাপ এবং পুণ্যের দৃষ্টিকোণ দ্বারা ন্যায় এবং দণ্ড সম্বন্ধে যেসব মান্যতা ছিলো-

রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ ।

নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥

শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাং প্রমুচ্যতে ।

রাজা পাপস্য তদবাপ্নোতি কিঞ্চিষম্ ॥

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড. ১৮/৩১,৩২)

অনুবাদঃ মানুষেরা পাপ করলে রাজারাও দণ্ডবিধান করেন, তার ফলে তাঁরা সুকৃতীকারী সন্ন্যাসীদের ন্যায় নির্মল স্বর্গে গমন করেন। অপরাধী যদি অপরাধ করেও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে সেক্ষেত্রে রাজাও পাপের ফলভাগী হন।

বাল্মীকি রামায়ণের উক্ত শ্লোকদ্বয়ের ন্যায় মনুস্মৃতিতেও বিদ্যমান -

শাসনাদ্বা বিমোক্ষাদ্বা স্তেনঃ স্তেয়াধিমুচ্যতে ।

অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিঞ্চিষম্ ॥

রাজভিঃ কৃতদণ্ডাস্ত কৃত্বা পাপানি মানবাঃ ।

নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥

(মনুস্মৃতি: ৮/ ৩১৬, ৩১৮)

অনুবাদঃ রাজা ঐ সুবর্ণচোরকে উক্ত মুষল প্রভৃতির দ্বারা আঘাত করলে কিংবা তাকে দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দিলে সেই সুবর্ণচোর চৌর্যজনিত পাপ থেকে মুক্ত হবে। (রাজা যদি বোঝেন, চোরকে মুক্তি দিলে সে শুদ্ধিলাভ করবে, তাহলে তাকে শাসন না করার জন্য রাজার কোনও দোষ, পাপ উৎপন্ন হবে না)। কিন্তু রাজা যদি চোরকে শাসন না করেন, তাহলে তিনি নিজেই চোরের পাপে লিপ্ত হন। মানুষেরা পাপ করে যদি রাজার দ্বারা প্রদত্ত দণ্ড ভোগ করে তাহলে তারা, ধার্মিকগণ যেমন নির্বাধে স্বর্গে গমন করেন, সেইরকম নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গে গমন করেন।

দণ্ড প্রদানে রাজা জ্ঞানশূন্য হয়ে পাপকর্ম করলে তার ফল ভোগ করেন-

অন্যৈরপি কৃতং পাপং প্রমত্তৈর্বসুধাধিপৈঃ ।

প্রায়শ্চিত্তং চ কুর্বন্তি তেন তচ্ছাম্যতে রজঃ ॥

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড. ১৮/৩৪)

অনুবাদঃ অন্যান্য রাজারাও উন্মত্ত হয়ে পাপকর্মে রত হলে প্রায়শ্চিত্ত করেন। তার দ্বারা তাঁদের পাপ লাঘব হয়।

দণ্ড প্রদানে রাজার অবশ্য কর্তব্য ন্যায্যোচিত তথা পক্ষপাত রহিত ।

একজনের অপরাধের জন্য বহুজনকে শাস্তি প্রদান অনুচিত -

নৈকস্য তু কৃতে লোকান্ বিনাশয়িতুমর্হসি ॥

(অরণ্যকাণ্ড. ৬৫/৯)

অনুবাদঃ অতএব একজনের অপরাধের জন্য বহুজনের বিনাশ আপনি করতে পারেন না ।

রাজাগণের কর্তব্য অপরাধ অনুসারেই সমুচিত দণ্ড প্রদান তথা কোমল স্বভাব, শান্ত প্রকৃতির হৃদয় অধিকারী হওয়া-

যুক্তদণ্ডা হি মৃদবঃ প্রশান্তা বসুধাধিপাঃ ।

সদা ত্বং সর্বভূতানাং শরণ্যঃ পরমা গতিঃ ॥

(অরণ্যকাণ্ড. ৬৫/১০)

অনুবাদঃ রাজারা হবেন কোমল স্বভাবের ও প্রশান্ত চিত্ত, তাঁরা অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব বিচারে যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করবেন ; আর আপনি তো সর্বদাই সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থল এবং তাদের পরমগতি ।

কিষ্কিন্দাকাণ্ডে ভরতের কর্তৃক ধর্মভ্রষ্ট পুরুষকে দণ্ড প্রদানের বর্ণনা রয়েছে -

গুরুধর্মব্যতিক্রান্তং প্রাজ্ঞো ধর্মেণ পালয়ন্

ভরতঃ কামযুক্তানাং নিগ্রহে পর্যবস্থিতঃ ॥

(কিষ্কিন্দাকাণ্ড. ১৮/২৪)

অনুবাদঃ বিদ্বানরাজ ভরত ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে দণ্ডবিধান করেন এবং ধার্মিককে পালন করেন। কামাসক্ত পুরুষকে তিনি নিগ্রহীত করেন।

অরণ্যকাণ্ডে মাতা সীতাকে রাবণ অপহরণের সময় সীতা বিলাপ করতে করতে ভগবান শ্রীরামকে দুর্বিনীতদের শাসনকর্তা নামে অভিহিত করেন -

ননু নামাবিনীতানাং বিনেতাসি পরন্তপ ।

কথমেবংবিধং পাপং ন ত্বং শাধি হি রাবণম্ ॥

(অরণ্যকাণ্ড. ৪৯/২৬)

অনুবাদঃ হে শত্রুতাপন আর্যপুত্র ! আপনি দুর্বিনীতদের শাসনকর্তা হয়েও এইরকম পাপী রাবণকে শাসন করছেন না কেন ?

যুদ্ধকাণ্ডে ভগবান শ্রীরাম রাবণকে বলেন তিনি অপরাধীদের যথাযোগ্য ন্যায় দণ্ড প্রদানকারী শাসক-

য়স্য দণ্ডধরন্তেঃ হং দারাহরণকর্ষিতঃ ।

দণ্ডং ধারয়মাণস্ত লঙ্কাদ্বারে ব্যবস্থিতঃ ॥

(যুদ্ধকাণ্ড: ৪১/৬৪)

অনুবাদঃ আমি দণ্ডধারী শাসক। আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। এই

কারণে আপনাকে দণ্ড দেবার জন্য আমি লক্ষা দ্বারে উপস্থিত হয়েছি।

দণ্ডিত ব্যক্তি কখনই দণ্ডের হাত থেকে রেহাই পায় না-

অপ্যেব দহনং স্পৃষ্ট্বা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ ।

রাজদণ্ডপরামুষ্ঠান্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনঃ ॥

(যুদ্ধকাণ্ড: ২৯/১২)

অনুবাদঃ দাবানল স্পর্শ করলেও বনের বৃক্ষরা জীবিত থাকতে পারে, কিন্তু রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কখনো বেঁচে থাকতে পারে না।

সং, ন্যায় দণ্ড প্রদানকারী ব্যক্তি এবং দণ্ডিত ব্যক্তি কখনোই তাদের কৃতকর্মের জন্য আফসোস করেন না-

দণ্ডে যঃ পাতয়েদ্ দণ্ডং দণ্ডো যশ্চাপি দণ্ড্যতে ।

কার্যকারণসিদ্ধার্থাবুভো তৌ নাবসীদতঃ ॥

(কিস্কিন্ধাকাণ্ড. ১৮/৬১)

অনুবাদঃ দণ্ডনীয় পুরুষের যিনি দণ্ডবিধান করেন এবং যিনি দণ্ডিত হন, কার্যকারণ সিদ্ধির জন্য তাঁরা কখনোই অবসন্ন অর্থাৎ দুঃখিত হন না।

রামায়ণ কালীন সময়ে ফাঁসি কার্যকর করা হতো প্রাতঃকালে । সুন্দরকাণ্ডে, সীতা মনে করেছিলেন যে দুই মাস পূর্ণ হলে রাক্ষস রাবণ আমাকে সেইভাবে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবে যেভাবে রাত শেষ হলে চোরকে হত্যা করা হয়।

দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া

মাসৌ চিরায়ান্তিগমিষ্যতো হৌ ।

বন্ধস্য বধ্যস্য যথা নিশান্তে রাজোপরোধাদিব তঙ্করস্য ॥

(সুন্দরকাণ্ড. ২৮/৭)

অনুবাদঃ আমি অতিশয় দুঃখিনী। আমার প্রতি রাবণকর্তৃক নির্দিষ্ট দুই মাস পর্যন্ত সময় শীঘ্রই সমাপিত হবে। রাজার আদেশে রাত্রিশেষে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী তঙ্করের ন্যায় আমার অবস্থা।

রামায়ণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিষয়েও বিবিধ শ্লোক উপলব্ধ -

উপাংশুদণ্ডেন হি মাং বন্ধনেনোপপাদয়েৎ ।

শঠঃ কুরো নৃশংসশ্চ সুগ্রীবো রাজ্যকারণাৎ ॥

বন্ধনাচ্চাবসাদান্মে শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্ ।

অনুজানন্তু মাং সর্বৈ গৃহং গচ্ছন্তু বানরাঃ ॥

(কিস্কিন্ধাকাণ্ড. ৫৫/১০, ১১)

অনুবাদঃ সুগ্রীব শঠ, কুর এবং নির্দয়। রাজ্যের জন্য তিনি আমাকে গুপ্ত দণ্ড দিয়ে চিরকালের জন্য বন্দি

করে রাখবেন। আমার পক্ষে বন্ধনজনিত অবসাদ অপেক্ষা অনশনে প্রাণত্যাগ করাই অধিক মঙ্গলকর।
হে বানরগণ ! আপনারা সকলে আমাকে অনুমতি দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন।
রামায়ণে শ্বাসরোধ করে হত্যা করারও উল্লেখ রয়েছে -

ততস্তু প্রঘসা নাম রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ।
কণ্ঠমস্যা নৃশংসায়াম্ পীড়য়ামঃ কিমাস্যতে ।
(সুন্দরকাণ্ড. ২৪/৪১)

অনুবাদঃ তদনন্তর প্রঘসা নামক রাক্ষসী বলে উঠল-“আমরা কেন অপেক্ষা করছি, এসো, এই নিষ্ঠুর
নারীর গলা টিপে মারি ” ।

অশোকবাটিকায় অবস্থানকালে মাতা সীতা বিলাপ করতে করতে তৎকালীন বিবিধ দণ্ডের কথা বলেছেন
ছিন্না ভিন্না প্রভিন্না বা দীপ্তা বাহ্নৌ প্রদীপিতা ।
রাবণং নোপতিষ্ঠেয়ং কিং প্রলাপেন বশ্চিরম্ ।।
(সুন্দরকাণ্ড. ২৬/১০)

অনুবাদঃ রাক্ষসীগণ ! তোমরা যদি আমাকে কাটো, চিরে ফেলো, টুকরো-টুকরো করে দাও, আগুনে
তপ্ত কর কিংবা পুড়িয়ে দাও, তবুও আমি কিছুতেই রাবণকে স্বীকার করব না। এতক্ষণ ধরে তোমাদের
প্রলাপ করা বৃথা !

উপর্যুক্ত শ্লোকসমূহ দ্বারা রামায়ণের সময়কালীন আর্যাবর্তে প্রচলিত বিভিন্ন ন্যায় এবং দণ্ডব্যবস্থা সমন্ধে
স্পষ্ট বর্ণন পরিচালিত ।

"শুভং ভূয়াৎ লেখকপাঠকয়োঃ"

বিদুষাং বশংবদঃ
শ্রী সৈকত দাস



বাল্মীকি রামায়ণে রাম-রাজ্যের মহিমা

দ্বিজেন চন্দ্র নাথ

নমস্কার সকলকে। পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে তাকে নিয়ে কিছু লেখার জন্য অনেক আশা নিয়ে বসলাম। কিন্তু লেখালেখির অনভিজ্ঞতার কারণে শুরুতেই বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। যাই হোক, পরমেশ্বরের নাম নিয়ে শুরু করলাম দেখা যাক কতটুকু যাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে আমরা সবাই কখনো না কখনো হিন্দু বন্ধুদের সাথে আড্ডায় হোক কিংবা বিশেষ করে ফেসবুক কमेंট একবার হলেও বলেছি "রাম রাজ্য চাই"। কিন্তু আমরা কী জানি কেমন ছিলো আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ভগবান শ্রীরামের সেই রাজ্য খানি? কেমন ছিলো তার মানুষজন? কেমনই বা ছিলো তাদের জনজীবন? চলুন তবে আজ আপনাদের ভ্রমণ করাই ভগবান শ্রীরামের রাজ্য।

"অযোধ্যা নগরী" যার নামই তার পরিচয় বহন করে। এ নগরী শ্রেষ্ঠ মানব মনু স্বয়ং নির্মাণ করেছিলেন [আদিকাণ্ড-৫-৬] এবং এ রাজ্য ছিলো ইক্ষ্বাকুরাজগণ কতৃক প্রতিপালিত [অযোধ্যাকাণ্ড-২-৫]। আধুনিক নগরীর মতো অযোধ্যা নগরীতেও ছিলো নাগরিক সুরক্ষা ও রাজ্যের সুরক্ষার জন্য উত্তম ব্যবস্থা-

কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্ ।

সর্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ ॥

(আদিকাণ্ড/৫/১০)

প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের গায়ে শালিত কপাট ও তোরণযুক্ত, সর্বপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত এবং সর্বপ্রকার শিল্পী যেখানে বাস করতো ॥

যোধানামগ্নিকল্পানাং পেশলানামমর্ষিণাম্ ।

সম্পূর্ণা কৃতবিদ্যানাং গুহা কেশরিণামিব ॥

(আদিকাণ্ড/৬/২১)

গুহা যেমন তেজস্বী বীর সিংহের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, অযোধ্যাপুরীও তদ্রূপ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ এবং অপমান-অসহনশীল যোদ্ধাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ॥

অযোধ্যার নগরীর সকলেই ছিলো উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রী -

তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্মান্মানো বহুশ্রুতাঃ ।
নরাস্তৃষ্টা ধনৈঃ সৈঃ সৈরলুকাঃ সত্যবাদিনঃ ॥
(আদিকাণ্ড/৬/৬)

সেই শ্রেষ্ঠ নগরীর অধিবাসীরা সকলেই ছিলেন আনন্দিত, ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, নির্লোভ, সত্যবাদী এবং স্ব স্ব উপার্জিত ধনে সদাই সন্তুষ্ট ॥

নাল্লসন্নিচয়ঃ কশ্চিদাসীৎ তস্মিন্ পুরোত্তমে ।
কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোহগবান্ধনধান্যবান্ ॥
(আদিকাণ্ড/৬/৭)

সেই উত্তম পুরীতে আত্মীয়বৎসল এমন কেউ ছিল না যে অল্পসঞ্চয়ী, পুরুষাথহীন এবং গোরু-অশ্ব-ধন-ধান্যবান নয় ॥

কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্ৰচিৎ ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥
(আদিকাণ্ড/৬/৮)

অযোধ্যতে কোথাও কখনও কামুক ব্যক্তি, কৃপণ, নিষ্ঠুর বা ভ্রুর ব্যক্তি, অশিক্ষিত এবং নাস্তিক ব্যক্তি দেখা যেত না ॥

সর্বৈ নরাস্চ নার্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযতাঃ ।
মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥
(আদিকাণ্ড/৬/৯)

অযোধ্যার সকল নরনারীই ছিল ধর্মপরায়ণ, সংযমী এবং সর্বদাই হৃষ্টচিত্ত; স্বভাব এবং আচরণে তারা ছিল মহর্ষিদের মতো নির্মল চিত্ত ॥

নানাহিতাগ্নিনাযজ্ঞা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সস্করঃ ॥
(আদিকাণ্ড/৬/১২)

অগ্নিহোত্রী নয় এবং অযাজ্ঞিক এমন কেউই অযোধ্যায় ছিল না। নীচমনা, চোর এবং অসদাচারী বা বর্গসস্কর কেউই সেখানে ছিল না ॥

নাস্তিকে নান্তী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ ।
নাসূয়কো ন চাশত্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্ৰচিৎ ॥ ১৪
(আদিকাণ্ড/৬/১৪)

কেউই নাস্তিক বা মিথ্যাবাদী ছিলেন না; কেউই অশিক্ষিত, পরদোষদর্শী বা অসমর্থ ছিলেন না ॥

নাষড়ঙ্গবিদত্রাস্তি নারতো নাসহস্রদঃ ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন ॥
(আদিকাণ্ড/৬/১৫)

অযোধ্যায় কেউই বেদের ষড়ঙ্গে জ্ঞানহীন ছিলেন না; সহস্রদান করেন না এমন কেউ ছিলেন না; কেউই ব্রতহীন, দুঃখী, দরিদ্র বা বিক্ষিপ্তমনা ছিলেন না ॥

বর্ণেষুথ্যাচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ ।
কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরা বিক্রমসংযুতাঃ ॥
(আদিকাণ্ড/৬/১৭)

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সকলেই ছিলেন দেবতা ও অতিথির পূজক, কৃতজ্ঞ, উদার, মিস্ত্রভাষী, বীর এবং প্রতাপশালী ॥

ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্ ।
ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
(যুদ্ধকাণ্ড/১২৮/৯৮)

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনদিন বিধবাদের বিরহ-বিলাপ শোনা যায়নি। সর্পাদি শ্বাপদের ভয় অথবা রোগভয় কখনও প্রাদুর্ভূত হয়নি ॥

নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদম্পৃশৎ ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে ॥
(যুদ্ধকাণ্ড/১২৮/৯৯)

সমগ্র রাজ্যের কোথাও চোর-ডাকাতের নাম পর্যন্ত শোনা যেত না। রাজ্যে কেউ অনর্থকারী কার্যে লিপ্ত হোত না কিংবা বৃদ্ধগণের কদাপি নবীনদের জন্য অন্তোষ্টি সংকার করার প্রয়োজন পড়ত না ॥

সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোহিভবৎ ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥
(যুদ্ধকাণ্ড/১২৮/১০০)

সকলে সদা আনন্দে থাকত এবং ধর্মাচরণ করত। শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে একে অন্যকে হিংসা করত না ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা লোভবিবর্জিতাঃ ।
স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্ঠাঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ ॥
(যুদ্ধকাণ্ড/১২৮/১০৪)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্বর্ণের প্রজাই নির্লোভ ছিলেন। সকলেই স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের কর্তব্যে পালনে সুপ্রসন্ন এবং নিজ-নিজ কর্মে রত থাকতেন ॥

এমনই ছিলেন রামরাজ্যের জনগন। তাদের রাজার জন্য তাদের ভালোবাসা ছিলো অতুলনীয়। রঘুনন্দন ছিলেন তাদের অতিপ্রিয় জন-

স তু শ্রেষ্ঠেষ্ঠৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ ।

বহিষ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড/১/১৯)

তিনি (শ্রীরাম) ছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণরাজি দ্বারা মণ্ডিত। স্বীয় সদগুণহেতু তিনি ছিলেন প্রজাদের নিকট বাহিরে বিচরণশীল প্রাণবায়ুর মতো প্রিয় ॥

রাজ্যের প্রতি যেমন প্রজাদের ভালোবাসা ছিলো তেমনই রাজ্যের অধিপতি ভগবান শ্রীরামও তার স্বরাজ্য ও রাজ্যের প্রজাদের পরিবার সমান প্রেম করতেন-

কৌসল্যায়াং যথা যুক্তো জনন্যাং বর্ততে সদা ।

তথৈব বর্ততেহস্মাসু জন্মপ্রভৃতি রাঘবঃ ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড/২০/৩)

রঘুনন্দন রাম জন্ম থেকেই যেমন জননী কৌশল্যার অনুরক্ত, আমাদের (প্রজাদের) প্রতিও সর্বদা সেইরকম (অনুরক্ত) ॥

এই ছিলো আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত রাম রাজ্য কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যতই বলি না কেন "রাম রাজ্য চাই, রাম রাজ্য চাই" আমাদের চাওয়াতেই রাম রাজ্য তৈরি হবে না। রাম রাজ্যের জন্য ভগবান শ্রীরাম তথা তার মতো ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যিনি একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ এবং প্রজাবৎসল। রাজ্যের প্রজাদের স্বরূপ আমাদেরও হতে হবে ধর্মপরায়ণ, সংযমী। সর্বোপরী রাম রাজ্য স্থাপন করতে চাইলে আমাদের সকলকে বেদের দিকে (বৈদিক সময়ে) ফিরে যেতে হবে। বেদের আজ্ঞা ধরে সকলকে আর্ষ হতে হবে এবং আর্ষে পরিণত করতে হবে।

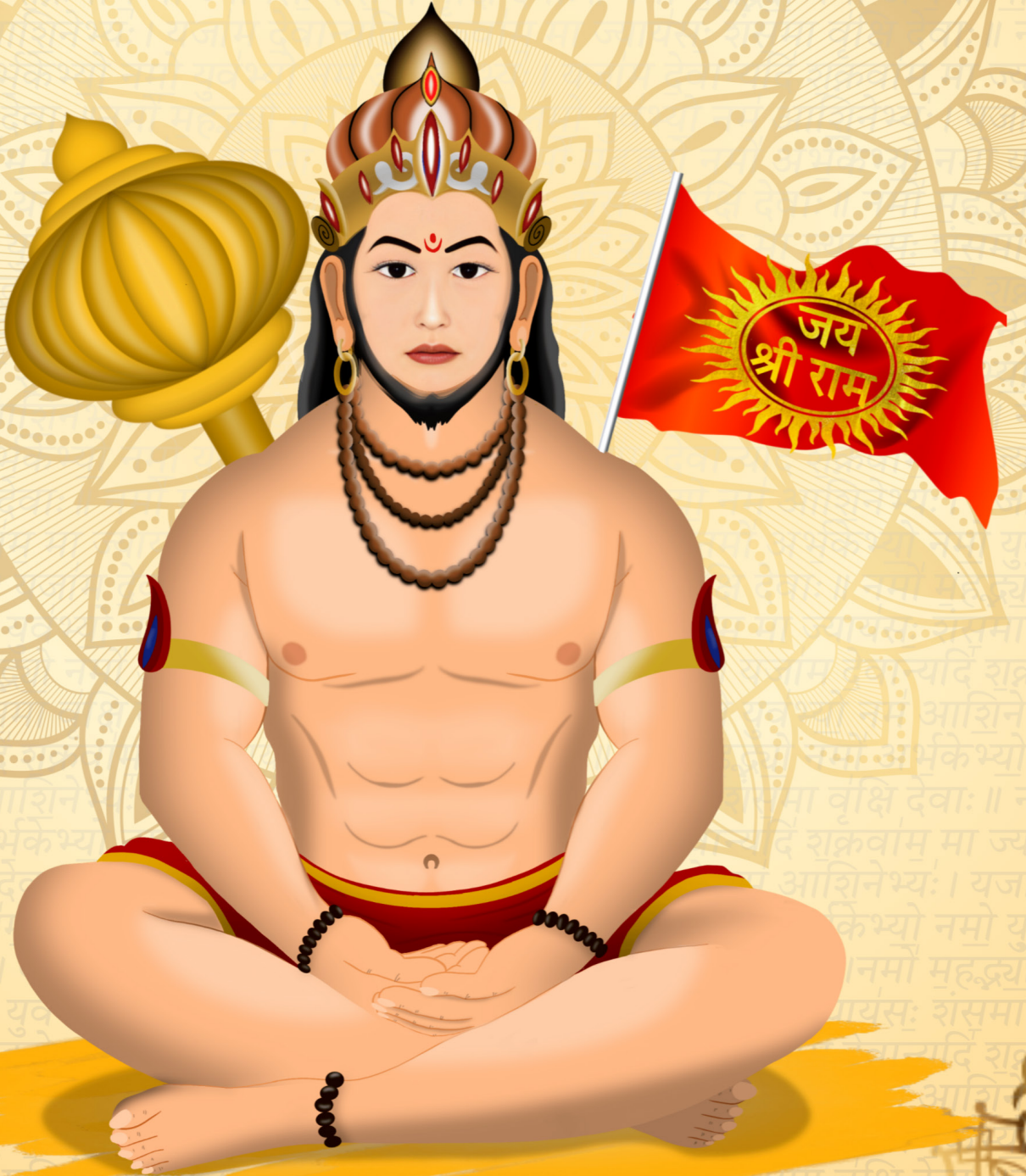
আজকের মতো এতটুকুতেই ইতি টানলাম। ভুলি ভ্রুতি হয়ে থাকলে মার্জনা করবেন। আশা করি আবার কোনো একদিন হাতে কলম তুলে নিবো অন্য কোনো বিষয়ে লেখার উদ্দেশ্যে।

নমস্কার সকলকে।

ওতম্ কৃথন্তো বিশ্বমার্যম্

ओ३म्
वीर हनुमान आर्य
राजवंशीय क्षत्रिय हिलेन

ड. सुरेन्द्र कुमार



अनुवादक- श्री सुरत देवनाथ

সবাইকে শ্রীরামনবমীর অজস্র শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

আজ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শুভ জন্মতিথি তথা শ্রী রাম নবমী। আজকের পুণ্য তিথিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্পর্কে অনেক কথা আমাদের বিদ্বানগণ লিখেছেন। তাদের গহন গবেষণাত্মক লেখনী অবশ্যই আপনাদের জ্ঞান ও শ্রদ্ধা বর্ধন করবে।

শ্রীরামচন্দ্রের অমর কথা সম্পর্কে মহর্ষি বাল্মীকি একটি অত্যন্ত সুন্দর শ্লোক রচনা করেছেন,

“যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।

তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিস্যতি॥”

“অর্থাৎ- যতকাল এই ধরণীতলে পর্বত দাড়িয়ে থাকবে আর নদীসমূহ প্রবহমান থাকবে ততকাল এই সংসারে রামায়ণ কথা প্রচারিত হবে।”-(বাল্মীকী রামায়ণ, আদিকাণ্ড ২/৩৬)

শ্রীরামচন্দ্রের কথা যেমন এই ধরণীতে চির অমর হয়ে থাকবে তেমনই অমর হয়ে থাকবে শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, জ্ঞান, ভক্তি, ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা সংকট মোচন মহাবীর শ্রীহনুমানের কথা।

হনুমানজীর প্রসঙ্গ যখন আসে তখন আধুনিক যুক্তিবাদী মহল থেকে এই মর্মে আপত্তি আসে যে, হনুমান তো বানর ছিলেন, অর্থাৎ পশু, আর একজন পশুর পক্ষে কিভাবে এমন শ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সহচর হওয়া তো সামান্য কথা নয়। এমন অসামান্য পদ একজন বানর অর্জন করেছিলো কিভাবে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অন্ধবিশ্বাসের কারণে পৌরাণিক হিন্দুগণ এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণে আগ্রহী নন। কিন্তু এই আগ্রহহীনতা আমাদের জন্য সর্বথা অকল্যাণই বয়ে এনেছে। বিদেশ এবং ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মবিরোধীরা সব সময় এ বিষয়টি নিয়ে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত এসেছেন। তাদের বিচার বিশ্লেষণের নমুনা দেখে আমরা তাদেরকে সত্যাত্মেয়ী বলতে পারি না। তাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেনতেন প্রকারেণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক তৈরী করে সব ইতিহাসকে মিথ্যা, মিথোলজি বলে ঘোষণা করা। অনেক অসৎ ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রীহনুমানকে, অনার্য, এমনকি দলিত বলেও ঘোষণা করেছে। এসব তাদের ঘোর মূর্খতা এবং স্বার্থপরতার পরিণাম।

অবশ্য একজন বানর (পশু প্রজাতি) শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, সর্বশাস্ত্রবিৎ পরম জ্ঞানী, কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। এই কথাগুলো নিতান্তই অবাস্তব। বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে এমন কথা গ্রহণযোগ্য তো নয়ই বরং এই প্রসঙ্গ রামায়ণের প্রামাণিকতার উপর একটি প্রশ্নচিহ্নও বটে। বিষয় গুরুগম্ভীর। সুতরাং এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা আবশ্যিক। আর্য সমাজের মহান বিদ্বান শ্রদ্ধেয় ড. সুরেন্দ্র কুমার জী এ প্রসঙ্গে একটি মহত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আবশ্যিকতা বিবেচনায় আমি এই প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করেছি। "হনুমানজী এবং তাঁর স্বজাতি বানর নাকি মনুষ্য? আশা করি, প্রবন্ধটি পাঠের পর বিচারশীল সজ্জনগণ এই প্রশ্নের একটি সুন্দর সমাধান পাবেন।

অনুবাদক

শ্রী সুব্রত দেবনাথ

বীর হনুমান আর্য রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন

ড. সুরেন্দ্র কুমার

বিগত কয়েক সহস্রাব্দ ধরে ভারতীয় সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিকতার যথার্থতাকে, অসম্ভব মিথকীয় শৈলী দ্বারা অন্ধবিশ্বাসী এবং ভারতীয়তা বিরোধী লেখকগণ এতোটা বিকৃত ও পরিবর্তন করে দিয়েছেন যে তাকে যথার্থ রূপে ফেরানো কঠিনতম হয়ে গেছে। ভারতীয়তা বিরোধী লেখকগণ এর অধিকাংশকে মিথোলজি এবং কল্পিত বলে ঘোষণা করে ইতিহাসের অস্তিত্ব নাশ করার প্রয়াস করে চলেছেন। এদিকে ভারতীয়দের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস এবং অযৌক্তিক আস্থা কারণে তকহীন, অসত্য ও অসম্ভব সবকিছু স্বীকার্য হয়ে আসছে। যদি ইতিহাসের সত্য স্বরূপ প্রস্তুত করা হয় তবে জনতার অনুভূতিতে আঘাত লাগে। আমাদের আইনের এমন অবস্থাও চিন্তার ব্যাপার যে, অভিব্যক্তির সমান সতন্ত্রতা হওয়ার পরও তাদের আস্থা ভঙ্গের মামলার প্রকরণকে ঝটপট স্বীকার করা হয়। যদিও অন্যদিকে মানবীয় প্রগতি এবং সত্যের যে বৌদ্ধিক আস্থা বা প্রামাণিকতা ভঙ্গ হয়ে চলেছে, তাকে উপেক্ষিত করা হয়। রাজনীতি এই বিকৃতিকে আরো বেশি বল প্রদান করেছে। একে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিবশতা বলুন অথবা বিড়ম্বনা, এর চক্রবৃহৎ আটকে ইতিহাসের সত্য স্বরূপ এবং যথার্থতা অভিমুখ্যর মতো বলি হয়ে যায়। এই অবসরবাদী রাজনীতিতে না তো সত্যকে গ্রহণ করার ইচ্ছাশক্তি আছে আর না তো সে সাহস আছে। বিগত কিছু সময় ধরে মহাপুরুষগণের বিরাট ব্যক্তিত্বকে সীমিত করার চেষ্টা চলছে। আর্যকে অনার্য হিসেবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। ঋষি বংশে উৎপন্ন আদিকবি বাল্মিকীর মতো ব্রহ্মর্ষির সাথে ডাকাত হওয়ায় ঘটনা জুড়ে দিয়ে উনার জীবনের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আর কিছুদিন পূর্বে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। একজন রাজনৈতিক নেতা, রাজবংশে উৎপন্ন আর্য ক্ষত্রিয় মহাপুরুষ বীর হনুমানকে দলিত বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। অন্ধ আস্থাবাদী লোকেরা নিজেদের ঐতিহাসিক মহাপুরুষগণের আরো বেশি অপমান করেছে। বংশের নামকে প্রতীক অর্থে গ্রহণ না করে নিজেদের শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষদের মধ্যে কাউকে বানর, কাউকে হাতি, কাউকে বরাহ, কাউকে মৎস আর কাউকে আবার অশ্ব ইত্যাদি পশু বানিয়ে রেখেছেন। ব্যাসনী এবং স্বার্থবাদী তথাকথিত অনুসারীগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষদের, মদ্য-মাংস, ভাং, আফিম, গাঁজা ইত্যাদির সেবনকারী এবং অনাচারের প্রবর্তক বানিয়ে রেখেছে। এমন করে যেমন তারা আমাদের মহাপুরুষদের কলংকিত করেছে তেমনই নিজেদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকেও দূষিত করেছে। আর এমন সব ধারণার পোষণ করার কারণে বিশ্বের বৌদ্ধিক জগতে আমরা নিজেদেরই উপহাসের পাত্র বানিয়ে রেখেছি। একজন শিশুও জানে যে কোনো পশু মানুষের সাথে না তো ভাষিক সংবাদ করতে পারে আর না তো বৌদ্ধিক ব্যবহার। তা ও আমরা নিজেদের অন্ধবিশ্বাস ছেড়ে সত্যকে স্বীকার করতে রাজি না। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এসব অন্ধবিশ্বাস এবং বিদ্ভূতের বিরুদ্ধে সত্যকে প্রকট করার সাহস করেছিলেন এজন্য তাঁকে বলিদান হতে হয়েছিলো। মহর্ষির দ্বারা স্থাপিত সংগঠন আর্যসমাজ এসব অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে বলে এ সংগঠনকে রুড়িবাদী সমাজ এবং রাজনীতির সাথে বারবার সংঘর্ষ করতে হয়েছে।

আর এসব ভুল ধারণাগুলো ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস, এবং দেশের জন্য মোটেও হিতকারক নয়। বিদেশীদের দ্বারা কল্পিত আর্য-অনার্য, আর্য-দ্রাবিড়, উত্তর-দক্ষিণ আদির ধারণা ভারতবর্ষের একতা অখণ্ডতা এবং দেশপ্রেমকে বিনষ্ট করে ভারতীয় সমাজ এবং দেশের অহিত সাধন করে চলেছে। অন্তত এবার আমাদেরকে ভবিষ্যতের চিন্তা করা উচিত।

এই লেখনীর উদ্দেশ্য হলো বীর শিরোমণি, শ্রীরাম ভক্ত হনুমান এবং তাঁর বানর সমাজের যথার্থ স্বরূপ প্রস্তুত করা। এ বিষয়ে জানার জন্য আমাদের কাছে রামায়ণকালের সর্বাধিক নিকটস্থ, প্রামাণিক এবং প্রাচীন গ্রন্থ হলো ঋষি বাল্মিকী রচিত রামায়ণ। যদিও এর মধ্যেও সময়ে সময়ে প্রক্ষেপ হয়েছে। এসব প্রক্ষেপের কথা এর মধ্যে প্রাপ্ত পরস্পর-বিরোধী অসম্ভব কথার মাধ্যমে বোঝা যায়। তবে রামায়ণে উপলব্ধ মূল শ্লোকগুলো ঐতিহাসিক যথার্থতাকে স্পষ্ট করে দেয়। চলুন রামায়ণ এবং পরবর্তী কিছু অন্য ঐতিহাসিক বিবরণের আলোকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করি।

হনুমানজীর বংশ এবং পরিচয়

হনুমান এবং তাঁর বানর সমাজ পশু বানর (বান্দর) ছিলেন না। তাঁরা মনুষ্য দেহধারী ছিলেন। যেমন, তাদের শারীরিক গঠন, রূপ-রং, শরীর ইত্যাদি মানুষের মতোই ছিলো। বানর ছিলো তাঁদের বংশের নাম। ভারতীয় বংশসমূহের মধ্যে আজও এমন বংশ-নাম, গোত্র-নাম, এবং প্রতীক-নাম পাওয়া যায় যা পশু পক্ষির নাম অনুসারে হয়ে থাকে, কিন্তু তারা মনুষ্য। বানর সমাজও তেমন ছিল। তারা বৃহত্তর আর্য সমাজের অন্তর্গত ছিলো। তাদের সংস্কৃতি সভ্যতা, শিক্ষাব্যবস্থা, পরম্পরা, বংশধারা ইত্যাদি সবই আর্যগণের সাথে হুবহু মিলসম্পন্ন ছিলো। (বানর শুধুমাত্র তাদের বংশের নাম। তারা জাতিগত দিক থেকে ভারতীয় আর্যই ছিলেন)

সংস্কৃতে ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে যে 'বানর বংশ' এর মূল উৎপত্তি 'ঋষি পুলহ' এবং তাঁর পত্নী 'হরিভদ্রার' দ্বারা হয়েছিলো। মাতার নাম অনুসারে বানর বংশকে 'হরি বংশ' এবং 'হরি গণ' ও বলা হতো। পরে বানর বংশের অনেক উপবংশীয় শাখার উদ্ভব হয়েছিলো যারা সম্পূর্ণ ভারতে বিস্তৃত ছিলো। কিস্কিন্ধ্যা রাজ্যেই বানর সমাজের এগারো শাখার মানুষ বাস করতো তাদের শাখাসমূহের নাম, বানর, ঋক্ষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শরভ, দ্বীপী, নীল, শল্যক, মার্জার, লোহাস ও মায়াব।

বনভূমিতে বসবাস করা এবং বন্য-পদার্থের দ্বারা নিজেদের জীবন জীবিকা চালানোর কারণে তাদের বংশের নাম 'বানর' হয়েছিলো। বানরের পর্যায় নাম 'বনৌকস্' হিসেবে রামায়ণে প্রযুক্ত হয়েছে। যার অর্থ, বনে বাস করা মানুষজন। যেমন আর্যগণ তৃতীয় আশ্রম গ্রহণ করে বনে নিবাস করাকে 'বানপ্রস্থ' ও 'বনস্থ' বলে থাকেন। কিছু অন্য উদাহরণ দ্বারাও এই প্রসঙ্গকে বোঝা যাক - আমরা জানি, পাহাড়ে বসবাস করা মানুষদের বলা হয় 'পাহাড়ি', সরস্বতী নদীর তীরের বাসিন্দাদের বলা হয় 'সারস্বত', পাঁচ নদীর প্রদেশ পাঞ্জাবের বাসিন্দাদের বলা হয় 'পাঞ্জাবী'। সিন্ধু, সিন্ধী (হিন্দ, হিন্দী, হিন্দু) নামও সিন্ধু নদীর তীরে নিবাস করার কারণে প্রচলিত হয়েছে।

হনুমানের পিতার নাম ছিলো, 'কেসরী'। তিনি সুমেরু পর্বতের কিছু অংশের রাজা ছিলেন। সুগ্রীবের নিমন্ত্রণ পেয়ে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, শ্রী রামের সহায়তার জন্য তিনি নিজের এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে এসে যুদ্ধ করেছিলেন। হনুমানজীর মায়ের নাম ছিলো, 'অঞ্জনা'। তিনি বানর বংশের এক রাজা 'কুঞ্জর' এর কন্যা ছিলেন। এছাড়া রামায়ণে হনুমানজীর পরিবারের কোনো অন্য কোনো সদস্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু এক স্থলে হনুমানজীকে রাজা কেসরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হয়েছে, (জ্যেষ্ঠঃ কেসরিণঃ পুত্রঃ...হনুমানিতি, ৬/৩৮/১০)। এ শ্লোকের মাধ্যমে সংকেত পাওয়া যায় যে হনুমানের অন্য ভাইও ছিলেন। পুরাণোক্ত বংশের বিবরণ থেকে জানা যায় যে হনুমানজীর চার ভাই ছিলেন। - শ্রুতিমান, কেতুমান, মতিমান ও ধৃতিমান। হনুমানের নিজের কোনো পরিবার (পত্নী, সন্তান, সন্ততি) ছিলো না কেননা তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁকে 'ব্রহ্মচারী', 'উর্ধ্বরেতা', 'জিতেন্দ্রিয়' বলে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়াও হনুমানজী অনেক অনেক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বুদ্ধিমত্তা, নীতিমত্তা, শক্তিসম্পন্নতা, বীরতা, নির্ভীকতা ইত্যাদি গুণের সমাহার কোনো একজন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু গুণাবলী একা হনুমানজীর মধ্যেই বিদ্যমান ছিলো।

মিত্রতার কারণে হনুমানজী সুগ্রীবের সচিব হয়েছিলেন। এবং শ্রদ্ধার কারণে শ্রীরামের সেবক তথা রাজদূত হয়েছিলেন। সুগ্রীব এবং শ্রী রামের সত্যনিষ্ঠ সহযোগী এবং সংকটমোচক হয়েও হনুমানজী ছিলেন বিন্দুতার প্রতিমূর্তি।

ঋষি বাল্মিকী লিখেন,

শৌর্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।

বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনুমতি কৃতালয়াঃ ॥

(উ০ কা০- ৩৫/৩)

অর্থাৎ - শূরবীরতা, চতুরতা, শক্তি, ধৈর্য্য, পাণ্ডিত্য, নীতিজ্ঞতা, পরাক্রম এবং প্রভাবশীলতা, হনুমান এই মহান গুণসমূহের অধিকারী ছিলেন।

হনুমানের হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার, ভাষা তথা বাচনভঙ্গি দেখে শ্রীলক্ষণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সামনে বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন - "নানুতং বক্ষ্যতে বীরো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। (কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ড-৪/৩২)

অর্থাৎ - শ্রী রাম! আমি বিশ্বাসের সাথে বলছি যে পবনপুত্র বীর হনুমান মিথ্যা বলতে পারেন না।

'হনুমান শুভমতি' (কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ড - ৪/৩৫),

'হনুমান মহানুভব' (কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ড- ২/২৯)

অপরাজেয় ক্ষত্রিয় যোদ্ধা

সুগ্রীব হনুমানকে মনুষ্য বলেছেন,

(মনুষ্যেন বিজ্ঞেয়াঃ, কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ড-২/২২)

আমাদের মান্যতা হলো এমন মানবীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তি মহামানব বলে গণ্য হন।

রাজ্য এবং রাজধানী

বানর সমাজের প্রধান রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার আশপাশের অঞ্চলসমূহে বিস্তৃত ছিলো। কিষ্কিন্ধ্যা ছিলো তাঁদের মূল রাজধানীর। বর্তমান কর্ণাটক প্রদেশের, জিলা 'বেল্লারী' এর স্থান 'হম্পী' এর নিকটে 'তুঙ্গভদ্রা' নদীর তটে স্থিত 'অনাগোন্দি' গ্রামকে প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা বলে মনে করা হয়। এটি একটি সমৃদ্ধ, বিকশিত নগরী ছিলো যা ছিলো পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। এই নগরের শোভা দেখার মতো ছিলো, যেমন- নগরের মধ্যে উদ্যান ছিলো, ধনীদের সুন্দর বাসভবন ছিলো, রাজ পরিবারের জন্য চাকচিক্যময় রাজমহল ইত্যাদি এখানে ছিলো। সুগ্রীবের রাজমহল সাত দুর্গের মধ্যে অবস্থিত ছিলো। যার দ্বারে শস্ত্রধারী প্রহরী ছিলো। নগরী চারিদিক থেকে সামরিক যন্ত্রের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলো। পাঠক বিবেচনা করুন, এমন নগরী কি কখনো (পশু) বানরদের দ্বারা স্থাপিত এবং শাসিত হতে পারে? এটা পৈতৃক পরম্পরা দ্বারা স্থাপিত বানর নামক বংশের মানুষদের রাজ্য ছিলো, আগে এর রাজা ছিলেন 'ঋক্ষরাজ'। তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বালী' সেখানকার রাজা হন। শ্রীরামের দ্বারা বালীর বধ করার পর সুগ্রীব রাজা হন। এর অতিরিক্ত সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে বানর বংশের লোকেদের অনেক ছোট ছোট রাজ্য বিস্তৃত ছিলো। রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় সুগ্রীবের ডাকে শ্রী রামের পক্ষে দুই ডজনের বেশিসংখ্যক বানরবংশীয় রাজা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। রামায়ণে এর বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে।

বানর-সমাজে বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপন:-

বাল্মিকীয় রামায়ণে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে বানর সমুদায়ে আশ্রম পদ্ধতিতে, বেদ, বেদাঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপন করা হতো। পুরুষের মতো নারীরাও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। এ কারণে রামায়ণের সব নারী-পুরুষ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। হনুমানজীকে বানর সম্প্রদায়ের সর্বশাস্ত্র জ্ঞাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান বলা হয়েছে। (বীর বানরলোকস্য সর্বশাস্ত্রবিদাং বর, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৬৬/২) উনার জন্য কবি দ্বারা প্রযুক্ত বিশেষণ তাঁকে উচ্চকোটির গম্ভীর বিদ্বান বলে সিদ্ধ করে। বাক্যকোবিদ, বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যকুশল, বাক্যবিশারদ, সুমহাপ্রাজ্ঞ, নয়পণ্ডিত ইত্যাদি।

সীতার খোজে, ঋষ্যমুক পর্বতের দিকে শ্রী রাম এবং লক্ষণকে আসতে দেখে ভয়ভীত সুগ্রীব তাদের পরিচয় জানার জন্য হনুমানকে তাদের কাছে পাঠান। হনুমান নিজের বেশভূষা ছেড়ে ব্রাহ্মণের বেশে রাম-লক্ষণের কাছে যান। সেখানে হনুমান শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা এবং পরিষ্কৃত বাক্য শৈলী দ্বারা শ্রী রামের সাথে বার্তালাপ করেন। বার্তালাপ শুনে লক্ষণ হনুমানের বিদ্বতার প্রশংসা করেন এভাবে-

নানৃথৈদবিনীতস্য নায়জুর্বেদধারিনঃ।

নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্।।

নুনং ব্যাকরং কৃৎস্নমেনে বহুধাশ্রুতম্।

বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশ্যদিতম্।। কিষ্কিন্ধ্যা. ৩/২৮,২৯

"যিনি বিধি অনুসারে ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেননি , তথা যিনি যজুর্বেদের অধ্যয়ন-মনন করেননি । যিনি সামবেদের বিদ্বান নয়। সেই ব্যক্তি এরকম শুদ্ধ ভাষা এবং উত্তম শৈলীতে বার্তালাপ করতে পারবেনা । এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনেকবার অধ্যয়ন করেছেন । কেননা ইনি অনেক কথা বলেছেন কিন্তু একটি শব্দও ভুল উচ্চারণ করেননি ।

হনুমানজী সম্পর্কে এমনই প্রশংসামূলক বর্ণন রামায়ণের অনেক জায়গায় পাওয়া যায় । সেখানে হনুমানকে ব্যাকরণ এবং ছন্দ শাস্ত্রের বিদ্বান হিসেবেও প্রশংসিত করা হয়েছে।

হনুমানজী সাহিত্যিক এবং বোলচালের সংস্কৃত উভয়ের জ্ঞাতা ছিলেন। মাতা সীতার খোজ পাওয়ার তিনি চিন্তা করলেন যে, সীতার সাথে আমার সে ভাষাতে কথা বলা উচিত যাতে তিনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্।।
যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি।।

(সুন্দরকাণ্ড ৩০/১৭/১৮)

অর্থাৎ - আমি সীতার সাথে সাধারণ মানুষের মতো সংস্কৃতে কথা বলবো। কেননা আমি যদি দ্বিজবর্গের মতো সাহিত্যিক সংস্কৃতে কথা বলি তাহলে সীতা আমাকে রাবণ মনে করে ভীত হবেন।

এ শ্লোকের মাধ্যমে কয়েকটি তথ্য স্পষ্টরূপে উঠে এসেছে ।

১. হনুমান অনেক ভাষা জানতেন।
২. রাবণ সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার ব্যাবহার করতো।
৩. রামায়ণকালে মানুষের মুখের ভাষা ছিলো সংস্কৃত।
৪. বানর সসম্প্রদায়ের মানুষরা সংস্কৃত ভাষায় পড়াশোনা করতেন ও কথা বলতেন। সংস্কৃত আর্যগণের ভাষা ।

এই প্রকারে বোঝা যায় হনুমান শস্ত্র এবং শাস্ত্র দুই ক্ষেত্রে প্রবীণ বীর বিদ্বান ছিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীও মহাবলী এবং মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনিও বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেছিলেন। একদিন বালীকে একা একা ঘুরতে দেখে রাবণ ছলপূর্বক বালীকে প্রহার করার প্রচেষ্টা করে। বালীও ঘটনা বুঝে নেন এবং রাবণকে ভ্রমিত করার জন্য মন্ত্র জপের মুদ্রায় দাড়িয়ে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ করতে থাকেন। কাছে আসামাত্র তিনি তড়িৎ গতিতে রাবণকে ধরে ফেলেছিলেন।

" জপন্ বৈ নৈগমান্ মন্ত্রান্ তস্থৌ পর্বতরাট্ ইব" (উত্তর-২৪/১৮)

অর্থাৎ বালী শান্ত এবং পর্বতের মতো নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে বেদ মন্ত্রের জপ করছিলেন।

সুগ্রীবও নিশ্চিত রূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর ভূগোলশাস্ত্রের বিশদ সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিলো। সীতার খোঁজে বের হওয়া সৈনিকদের তিনি সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বাল্মিকী সুগ্রীবকে 'মহাবীর্য', 'ধৃতিমান', 'মতিমান', 'মহাবল', 'পরাক্রমশালী' ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ দ্বারা প্রশংসিত করেছেন। (অরণ্যকাণ্ড -৭২/১৩/১৪)

রাণী তারার পিতা 'সুষেণ' সিদ্ধহস্ত বৈদ্য ছিলেন। যিনি যুদ্ধে আহত শ্রী রাম, লক্ষণ এবং অন্য বানর বীরদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

'নল' এবং 'নীল' দুইভাইয়ের অভিযান্ত্রিকী বিদ্যায় (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিশেষজ্ঞতার ব্যাপারে আমরা বহু সময় ধরে পড়েগুনে আসছি। যারা শ্রীরামের বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য রাস্তা, ও সমুদ্রে সেতু নির্মাণের মতো অদ্ভুত কার্য করেছিলেন।

এভাবে 'জাম্ববান', 'শরভ', 'মৈদ', 'দ্বিবিদ' আদি যুথপতিদের শাস্ত্রজ্ঞতা তথা কলাকুশলতার বর্ণনও এসেছে। এনারা সবাই যুথপতি রাজা ছিলেন এবং সবাই সুশিক্ষিত ছিলেন।

বালীর পত্নী 'তারা' এবং সুগ্রীবের পত্নী 'রুমা'ও বেদবিদ্যুযী শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন। তারা বেদমন্ত্রবিৎ ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে যুদ্ধের জন্য নগরের বাইরে যাওয়ার পূর্বে বালীর পত্নী তারা 'স্বস্তিবাচন মন্ত্র' দ্বারা নিজের পতির মঙ্গলকামনা করেছিলেন। যদি বালী দূরদর্শিনী তারার পরামর্শ মেনে নিতো তাহলে তার মৃত্যু হতো না। (ততঃ স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা মন্ত্রবিত্ব বিজয়েষিণী, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৬/১২) বালীর বধের পর শ্রীরামের সাথে বার্তালাপের সময় 'তারা' বেদের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছিলেন। বাল্মিকী তাঁকে 'পণ্ডিতাঃ', 'সর্বজ্ঞা', 'রাজনীতির সূক্ষ্ম বিবেচিকা', 'ভবিষ্যতের আভাস জানা' ইত্যাদি গুণবাচক শব্দদ্বারা প্রশংসিত করেছেন।

সুগ্রীবপত্নী 'রুমা' জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিদ্যুযী ছিলেন।

অন্যাদি বিদ্যা এবং শিল্পকলার প্রশিক্ষণও কিষ্কিন্ধ্যায় দেওয়া হতো। যেমন, সংগীত বিদ্যা, ভবন নির্মাণ বিদ্যা, বস্ত্রনির্মাণ বিদ্যা, অলংকার তৈরী, অস্ত্রশস্ত্র তৈরী, চিত্রকলা, ইত্যাদির বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়।

আর্য সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং পরম্পরা

বানরবংশের মানুষজন যেহেতু ঋষিদের দ্বারা রচিত বৈদিক শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে তাদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং পরম্পরাও বৈদিক ছিলো। একথার প্রমাণ হলো, বানর বংশের লোকজন যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন। শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে উপনয়ন সংস্কারের আয়োজন

দ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রদান করানো হতো। রামায়ণে বর্ণন এসেছে, বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় চিতায় অগ্নিসংযোগের পর পুত্র অঙ্গদ যজ্ঞোপবীতকে ডান স্কন্ধে ধারণ করে চিতাকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। (ততোহগ্নি বিধিবদ্ দত্তা সো অপসব্যং চকার হ, কিষ্কিন্ধ্যা ২৬/৫০) 'অপসব্য' যজ্ঞোপবীত ধারণ করার সেই বিধি যাতে যজ্ঞোপবীত ডান স্কন্ধে রেখে বাম হাত দিয়ে নীচে ঝুলানো হয়। পৌরাণিক ব্যাখ্যাকারগণ এই তথ্যের ব্যাখ্যা না করে ছেড়ে দিয়েছেন। এটা উনাদের পক্ষপাতী দুরাগ্রহ।

বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতি যেহেতু ছিল সুতরাং তাঁরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিলেন। হনুমানজী এক্ষেত্রে স্পষ্ট উদাহরণ। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাছাড়া রামায়ণে এই প্রমাণও পাওয়া যায় যে বানর সম্প্রদায়ের লোকজন অন্য আশ্রম ধারণ করতেন। মাতা সীতার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হনুমান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যদি সীতার খোঁজ না পাই তাহলে আমি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাব না, বানপ্রস্থ আশ্রম ধারণ করে নিবো। (বানপ্রস্থোভবিষ্যামি হি- অদৃষ্টবা জনকাত্মজাম্, সুন্দরকাণ্ড- ১৩/৪০)

কিষ্কিন্ধ্যায় বিদ্বান ব্রাহ্মণও ছিলেন, যারা বৈদিক শাস্ত্রবিধি অনুসারে বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংস্কার তথা সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক সংস্কার করিয়েছিলেন।

বানর বংশের লোকজন সন্ধ্যা-উপাসনা, যজ্ঞ ইত্যাদির অনুষ্ঠানও করতেন। বালীর বেদমন্ত্র দ্বারা সন্ধ্যোপাসনা করার এক লম্বা প্রসঙ্গ রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে (বালিনং সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্, উত্তর, ৩৪/১২, ২৭, ২৯)

তারা শ্রীরামের সামনে নিজের যজ্ঞাধিকার বিষয়ক সংবাদ করেছিলেন। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৪/৩৮)

বানরগণের মধ্যে বিবাহ বিধি দ্বারা পতি-পত্নীর সম্পর্ক গড়ার পরম্পরা ছিল।

তারা অসত্য কথা বলাকে পাপ এবং সত্যকে পুণ্য বলে মনে করতেন। এজন্য প্রতিজ্ঞা করার সময় সত্যের শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতেন। (সত্যেন শপাম্যহম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৮/২৭)

তারা বৈদিক বিধি অনুসারে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নামোচ্চারণপূর্বক চরণস্পর্শ করে প্রণাম করতেন। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৩/২৪)

বানরগণ বিশুদ্ধ শাকাহারী ছিলেন। মাংসাহার করতেন না। কন্দ-মূল, ফল-ফুল, অন্ন আদি পদার্থ ভোজন করতেন। (ফলমূলাশনং নিত্যং বানরং বনগোচরম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৭/২৫)

সংস্কার এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান বৈদিক শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে করা হতো। এসব অনুষ্ঠানের জন্য বানরসমাজে

প্রশিক্ষিত বিদ্বান ব্রাহ্মণও ছিলেন। সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক মহর্ষিদের দ্বারা বিহিত শাস্ত্রীয়-বিধি অনুসারে বেদমন্ত্র দ্বারা করা হয়েছিলো। এই উপলক্ষ্যে যজ্ঞের আয়োজনও করা হয়েছিলো।

"মন্ত্রপুতেন হবিষা হুত্বা মন্ত্রবিদো জনাঃ ॥"

"শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষি বিহিতেন চ।"

"অভ্যষিধত সুগ্রীবম্"।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৬/৩০, ৩৬, ৩৮)

এই প্রকারে বালীর অস্তিত্ব সংস্কারও শাস্ত্রবিধি অনুসারে রাজাদের প্রতিষ্ঠার অনুরূপভাবে করা হয়েছিলো। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৫ সর্গ)

এই প্রসঙ্গে বালীকে স্পষ্টভাবে আর্ষ রাজা বলা হয়েছে ("আর্ষস্য ক্রিয়তাম্" "রাজ্ঞাম্...তাদৃশৌঃ কুবন্তু" কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৫/৩০, ৩২)

বানর সমাজে 'আর্ষ' সম্বোধন

আর্ষ সংস্কৃতির শিষ্টাচার অনুসারে যেভাবে সীতা আদি স্ত্রী গণ নিজেদের প্রতি শ্রীরাম আদিকে 'আর্ষপুত্র' বলে সম্বোধন করতেন। এই প্রকারে বানর বর্গের রানী তারা নিজের পতি বালীকে 'আর্ষপুত্র' বলেই ডাকতেন। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৯/২৭, ২০/১৩)

সুগ্রীবও বালীকে আর্ষ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা সম্বোধন করেছিলেন। (...আর্ষস্য..., কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৪/২৯)

বানর বংশের লোকজন 'অনার্য' শব্দকে অপশব্দ বা গালি বলে গণ্য করতেন। সীতার খোঁজ শুরু করায় বিলম্ব করার কারণে লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে 'অনার্য' ও 'কৃতঘ্ন' বলে তিরস্কার করেছিলেন। (যেসব শব্দ নিঃসন্দেহে সুগ্রীবের জন্য অপমানজনক ছিলো।) তাহলে হনুমান আদিকে অনার্য কিভাবে বলা যায় ?

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক তথ্য এর আলোকে নির্বিবাদ রূপে বলা যায় যে, হনুমান এবং তাঁর বানর সমাজ আর্ষ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন। যেসব লেখকগণ তাদেরকে অনার্য বলেছেন তারা বানর সমাজের সাথে অন্যায় করেছেন এবং সাথে সাথে ভারতীয় ইতিহাসকেও বিকৃত করেছেন। যারা শ্রদ্ধা ভক্তির নামে হনুমানজী আদিকে বানর বলে মান্য করেন, তারা নিজেদের শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষদের ঘোর অপমান করে চলেছেন। মহামানবকে পশুর রূপ দেওয়া মানে তাদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করা। সত্য তথ্যকে স্বীকার করে সবার এসব পরিত্যাগ করা উচিত।

ओ३म्



आर्य जगतेर महान विभूति, शास्त्रार्थ महारथी
“पण्डित रामचन्द्र देहलवी”

नमस्कार सुप्रिय पाठकगण। सबাইके श्रीरामनवमीर अनेक अनेक शुभेच्छा। आज येमन आमामेदेर भगवान श्रीरामचन्द्रेर जन्मतिथि तेमनई आमामेदेर आर्य जगतेर एक महान विभूति श्री पण्डित रामचन्द्र देहलवी जीरु जन्मतिथि। पण्डितजीर नाम अनेके हयतो शुने থাকबेन। तिनि वेद ओ समग्र वैदिक शास्त्रेर अपूर्व मञ्चनकर्ता तथा सर्वशास्त्र निष्ठात प्रकाणु विद्वान हओयार साथे साथे एकजन तूमूल जनप्रिय बज्जा, धर्मप्रचारक एवं विख्यात शास्त्रार्थ महारथी छिलेन। पौराणिक, मुसलिम, ख्रिस्तान इत्यादि अबैदिक मतबलस्वीदेर काछे पण्डितजी छिलेन मूर्तिमान आतंक। ताँर तेजस्वी भाषणेर सामने समस्त अबैदिक मत विध्वस्त हतो। पण्डितजीर समये भारतवर्षेर विभिन्न स्थाने शास्त्रार्थ वा वितर्केर आयोजन करा हतो। सेसब वितर्के पण्डितजी छिलेन दिग्विजयी शास्त्रार्थ महारथी। ताँर साथे शास्त्रार्थ जेतार हिम्मे

কোনো পৌরাণিক বিদ্বান, মোল্লা, বা পাদ্রীদের ছিলো না। এমনকি এমনও শোনা যায় যে পণ্ডিতজীর নাম শুনে তার বিপক্ষী বক্তা শাস্ত্রার্থ না করে পালিয়ে গিয়েছেন।

অবৈদিক মতাবলম্বী দের কাছে আতংক হলেও ধর্মপ্রেমী সত্যান্বেষী সজ্জনবৃন্দের কাছে পণ্ডিত জী অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর তেজস্বী ও অত্যন্ত বিদ্বতপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করে সবাই মুগ্ধ হতেন। পণ্ডিতজীর বিরোধী লোকজন তাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং প্রমাণবহুল খণ্ডন শুনে নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। এবং তার প্রশংসা করে ফিরতেন। বৈদিক সাহিত্যের অপূর্ব মন্তনকর্তা বিদ্বান এবং জৈন, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, ইসলাম ও খ্রিস্টমতের মহান শাস্ত্রবিৎ হওয়ার সাথে সাথে পণ্ডিতজী সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, আরবী, ফারসি ইত্যাদি ভাষা ও ব্যাকরণ আদির পূর্ণ বিদ্বান ছিলেন। আজ আর্ষ জগতের এই মহান বিভূতি পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্রজীর পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষ্যে এই মহান বিদ্বানের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করছি-

মূল নিবাস

পণ্ডিতজীর পিতামহ দিল্লীর মূল নিবাসী ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম সতন্ত্রতা সংগ্রামের কিছুদিন পূর্বে তিনি পরিবার সহিত মালবা গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

পরিবার পরিচয়

পণ্ডিতজীর পিতার নাম ছিলো মুন্সী ছোটেলাল। তিনি বড়ো তেজস্বী মেজাজের ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজ অফিসারদের উর্দু ও ফারসি ভাষা শেখানো তাঁর কাজ ছিলো। তিনি ধার্মিক বিচারে, সম্পূর্ণ আর্ষসমাজী কিংবা সম্পূর্ণ পৌরাণিক কোনোটাই ছিলেন না। আর্ষসমাজ মন্দির এবং পৌরাণিক মন্দির উভয় স্থানেই যাতায়াত করতেন এবং বলতেন যে না জানি কখন কি মিলে যায়।

পণ্ডিতজীর মাতার নাম ছিলো শ্রীমতী রামদেই। তিনি মালবার কোনো এক ভীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভীলদের গ্রামে থাকায় তিনি একজন নির্ভীক নারী ছিলেন।

পণ্ডিতজী তাঁর মাতা পিতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। পণ্ডিতজীর বড় ভাইয়ের নাম শ্রী শিবকরণ জী। পণ্ডিতজীর জন্মের আগে তাঁর মাতা পিতার তিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং মারা যায়। এতে তাঁর মাতা-পিতা খুবই দুঃখী ছিলেন। পুনরায় সন্তান যাতে মারা না যায় এজন্য তাঁরা অনেক জপ-তপ করেন এবং নানা রকম লোকাচার পালন করেন।

জন্ম

৮ এপ্রিল ১৮৮১ তদানুসারে চৈত্র শুক্ল নবমী সম্বৎ ১৯৩৮ বিক্রমাব্দে পণ্ডিতজীর জন্ম হয়। পণ্ডিতজীর জন্মের দিন মহা রামনবমী তিথি ছিলো। এই শুভদিনে শিশুর জন্ম হওয়ায় তাঁর মাতা-পিতা খুশি হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম অনুসারে নবজাতক শিশুর নামকরণ করেন। খুব আদর যত্নের সাথে শিশু রামচন্দ্রের পালন শুরু হয়। পণ্ডিতজীর মা তাকে খুবই ভালোবাসতেন। রাগী মেজাজী পিতা

অনেকসময় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বালক রামচন্দ্রকে প্রহার করতে উদ্যত হলে মাতা বলপূর্বক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন, "যাই হয়ে যাক না কেন, আমার ছেলের গায়ে কাউকে হাত তুলতে দেব না।" রামচন্দ্রজীর পরে তাঁর ছোট দুই ভাইয়ের জন্ম হয়, তাঁদের নাম শ্রী শিবলাল জী ও শ্রী জিয়ালাল জী।

মাতৃবিয়োগ

রামচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখনই তাঁর মা দেহত্যাগ করেন। মায়ের মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের দুঃখের দিন শুরু হয়। মায়ের অভাবে ঘর সংসারের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। সাত বছরের বালক রামচন্দ্র তখন থেকেই ঘরের কাজ সামলাতে শুরু করেন। প্রায় দশ মাস ধরে তিনি নিজের ছোট দুই ভাইকে খাবার বানিয়ে খাওয়ান। ঘর সামলান। এরপর পণ্ডিতজীর পিতা মুন্সী ছোটেলাল দ্বিতীয় বিবাহ করে নেন। তাঁর সৎ মায়ের নাম ছিলো লাডী। পণ্ডিতজী বলতেন, লাডী অত্যন্ত সুন্দর এবং সুশীল নারী ছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে কখনো মা বলে ডাকতে পারিনি, লাডী বলেই ডাকতাম। সৎ মায়ের গর্ভে রামচন্দ্র জীর আরও দুই ভাই উৎপন্ন হয়। শ্রী মগনলাল ও শ্রী ছগনলাল। এর মধ্যে বাল্যাবস্থাতেই মগনলালের মৃত্যু হয়ে যায়।

শিক্ষাজীবন

ঘরের কাজের সাথে বালক রামচন্দ্র পড়াশোনাতেও মনোনিবেশ করেন। নীমচের একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করতেন। রামচন্দ্র জী বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন বালক ছিলেন। তাঁর স্কুলে একই ক্লাসে আবিদ আলী নামক একজন বালক পড়াশোনা করতো। ক্লাসে কখনো রামচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করতেন কখনো আবিদ আলী প্রথম হতেন।

এখানে রামচন্দ্র ইংরেজির সাথে সাথে ফারসির প্রথম পাঠ অধ্যয়ন করেন। এরপর আজমেরের ডি.এ.বি স্কুল থেকে প্রথম গ্রেডে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

নিজের কঠিন পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে পণ্ডিতজী একবার বলেছিলেন, "আমি আজমেরে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে এক কক্ষে থাকতাম। যখন প্রথম পত্র দিয়ে ফিরে নিজের হাতে রুটি তৈরী করতাম। এবং সেই রুটি দই দিয়ে খেতাম। কয়েকদিন ধরে এভাবে শুধু দই রুটি খাওয়ায় আমার জ্বর হয়ে যায়। আর আমাকে এভাবে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল অবস্থাতেই পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো।"

রামচন্দ্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু এর পর রামচন্দ্রের পিতা তাঁর পড়াশোনায় আপত্তি করে দেন এবং পড়াশোনা বাদ দিয়ে তাঁর সাথে দোকানে কাজ করার জন্য বলেন। রামচন্দ্রজীর পড়াশোনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিলো। তিনি আরো পড়াশোনা করতে চাইছিলেন। কিন্তু বাবা তো আর পড়াশোনার খরচ দিবেন না। এজন্য রামচন্দ্র বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে নেন। তাঁর বড় ভাই শ্রী শিবকরণ জী নীমচ এর নিকটে কোথাও রেলকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি পালিয়ে তাঁর বড়ো ভাইয়ের কাছে চলে যান। এবং তার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহের কথা জানান। সব শুনে শিবকরণ জী

তাঁকে নিজের কাছে রেখে পড়াশোনার ব্যাবস্থা করে দেন। ইন্দোর কলেজ থেকে রামচন্দ্র জী এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এবং তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা এখানেই সমাপ্ত হয়ে যায়।

বিবাহ এবং কর্মজীবনের শুরু

রামচন্দ্রের সৎ মা তাঁর বাবার তুলনায় কম বয়সী ছিলেন। বিধায় সন্তানোৎপাদন তথা প্রসবের সময় তাঁর খুবই কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো। তৃতীয় সন্তানের জন্মের সময় প্রসব কষ্টের কারণে তাঁর দেহাবসান হয়। গৃহিণীর অভাবে গৃহের অবস্থা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ঘরে পুনরায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় ছিলো রামচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন করা এবং সেটাই করা হলো। দিল্লীর কন্যা শ্রীমতি কমলা দেবীর সাথে অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর ধর্মপত্নীর নাম ছিলো, শ্রীমতী কমলা দেবী। তিনি দিল্লীর কন্যা ছিলেন।

বিবাহের পর ছিন্ন-ভিন্ন পরিবারের সব দায়িত্ব রামচন্দ্রজীর কাছে এসে পড়ে। তাই তিনি যেখানে পড়াশোনা করেছিলেন নীমচের সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি নেন। মানুষ স্কুলে নতুন শিক্ষক এলে তাঁর যোগ্যতা, বিদ্বতার পরীক্ষা নিতে থাকে। রামচন্দ্র জীকেও সবাই তেমন পরীক্ষা করে। নতুন নতুন কঠিন সমস্যা এনে সমাধানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করে। কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিত রামচন্দ্রজী অত্যন্ত সরলতার সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তা সবই সমাধান করে দিতে থাকেন। এমন গুণের কারণে সবার তিনি সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

ধীরে ধীরে তাঁর পারিবারিক সমস্যা ও দারিদ্র্যতা দূর হতে থাকে। এবং রামচন্দ্র জী নিজের বৈবাহিক জীবন শুরু করেন। সর্বপ্রথম তাঁর এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

রাজস্থানি গ্রাম্য মহিলারা সেকালে কলহ বিবাদে জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কপট চাল, কুটিল বাক্য, এবং ছলকপট ছিলো তাদের অস্ত্র। নীমচে থাকাকালীন পণ্ডিতজীর সহধর্মিণীর সাথে কিছু প্রতিবেশী মহিলা ঝগড়া বাধায়। এবং দিনে দিনে সেখানকার পরিস্থিতি অশান্তিময় হয়ে উঠতে থাকে, পণ্ডিতজী যখন এসব জানতে পারেন তখন নিজের পরিবার সমেত দিল্লিতে চলে যান। দিল্লিতে গিয়ে সেখানে 'রৈলী ব্রাদার' নামক একটি ইংলিশ ফর্মে মাসিক ১৫ রুপি বেতনে নতুন চাকরি নেন। পণ্ডিতজী অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁর হিন্দি এবং ইংরেজি হাতের লেখাও অত্যন্ত সুন্দর এবং গোছানো ছিলো। কোম্পানির মালিক রামচন্দ্রজীর অসাধারণ হাতের লেখা এবং কাজকর্মের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। তিনি ছুটির দিনেও রামচন্দ্রজীকে অফিসে ডেকে নিতেন। একবার কোনো এক কারণবশত পণ্ডিতজী মালিক সাহেবের ডাকে অফিসে যেতে পারেন নি। এজন্য পরেরদিন সাহেব তাঁকে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। পণ্ডিতজী নির্ভীক চিত্তে উত্তর দেন, "রবিবার তো আমার ছুটির দিন ছিল। আর আমার কাজও ছিলো, এজন্য আসি নি। Even God rested on the seventh day. সেখানে আমি তো মানুষ। গডও(খ্রিস্টানদের) সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন, সুতরাং আমারও সপ্তাহে একদিন ছুটি পাওয়ার অধিকার আছে।" সাহেব এমন উত্তরে মনে মনে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, "Well ! Mr.

Ram Chandra , I want to do something but leave it now.” রামচন্দ্রজী অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি শীঘ্রই কোম্পানিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন। এবং চাকরি থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর নিজের শ্বশুরের স্বর্ণালংকার তৈরির দোকানে কাজে লেগে পড়েন।

পণ্ডিতজীর সততা ছিলো চমকপ্রদ। গহনা বানানোর জন্য যেই সোনা লোকজন দোকানে দিয়ে যেতো সেসবকে তিনি আলাদা আলাদা পুটলিতে বেধে রাখতেন। যখন কেউ নিজের দেওয়া সোনা গহনা না বানিয়েই নিয়ে যেতে চাইতো তখন তিনি সেই বেধে রাখা পুটলি তাকে দিয়ে দিতেন। সোনার পরিমাণ যেভাবে ছিল ঠিক তেমনই আছে এটা দেখে অনেকেই আশ্চর্য হতেন। কেননা অনেক স্বর্ণকার সোনার পরিমাণে গড়মিল করতো। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রামচন্দ্রজী স্বর্ণকারের কাজ শিখে নেন এবং একজন দক্ষ কারিগর হয়ে উঠেন।

সন্তানাদি

দিল্লীতে এসে পণ্ডিতজীর পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়। চার কন্যা এবং এক পুত্র। এর মধ্যে তিন কন্যাসন্তান শৈশবে মারা যায়। এভাবে তাঁর সন্তানাদির সংখ্যা কেবল তিন কন্যাই থেকে যায়। কন্যাদের জন্মে তাঁকে কখনোই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে দেখা যায় নি বরং তিনি সদা প্রসন্নই হতেন। পণ্ডিতজীর পুত্র শিশুটি দেখতে খুবই সুন্দর ছিলো। একেবারে যেন পণ্ডিতজীর মতো! পুত্রের মুখ দেখে পণ্ডিতজী বলেছিলেন, "এতো সুন্দর শিশু তো আমার ঘরে থাকার যোগ্য নয়।" পণ্ডিতজীর একথা সত্য হয়ে গেল, জন্মের মাত্র ১৮ দিন পরেই সে শিশুটি মারা যায়। পুত্রসন্তানের মৃত্যুতে পণ্ডিতজীর পত্নী কমলা দেবী শোকে কাতর হয়ে যান। তিনি অনেকদিন অসুস্থও ছিলেন। সন্তানাদির মৃত্যুতে তিনি(কমলাজী) বার বার অশ্রুপাত করতেন। অনেক সময় শিশুদের মতো কান্নাকাটিও করতেন। মহল্লার যেকোনো শিশুর মৃত্যুর খবর শুনলেও অনেক দুঃখ প্রকাশ করতেন। এসময় পণ্ডিত জী তাঁর খুব সেবা শুশ্রূষা করেন।

পণ্ডিতজীর পত্নী কমলাদেবীর মৃত্যু

ছোট কন্যার জন্মের পর কমলাদেবী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হন। এবং এই রোগই তাঁর জন্য প্রাণঘাতী হয়ে যায়। পণ্ডিতজী প্রাণপণে তাঁর সেবা-যত্ন করেন। কিন্তু তিনি নিজ অর্ধাঙ্গিনী- কে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। কমলাদেবী সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দেহত্যাগ করেন।

পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে অসম্মতি

নিজ ধর্মপত্নী কমলাদেবীর মৃতদেহে হাত রেখে পণ্ডিতজী প্রতিজ্ঞা করেন, " দেবী যে দৃষ্টিতে আমি তোমাকে দেখেছি এখন এমন দৃষ্টি আর কোন শরীরের উপর পড়বেনা। এই দৃষ্টি (স্ত্রীর দৃষ্টিতে দেখা)

তোমার শরীরের সাথেই সমাপ্ত হলো। এখন জগতে আমার জন্য মাতা, ভগিনী এবং কন্যার ন্যায় সম্পর্কই থাকবে।" কমলাদেবীর দেহাবসানকালে পণ্ডিতজীর বয়স মাত্র ৩৬ বছর ছিলো। ধর্মজগতে পণ্ডিতজীর পদচারণা থাকায় তাঁর সুখ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। পণ্ডিতজীর গুণমুগ্ধা অসংখ্য রূপবতী, গুণবতী, বিদ্যা ও ধনবান তরুণী তাঁকে সহস্রে লিখিত বিবাহের প্রস্তাবপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু পণ্ডিত রামচন্দ্রজী নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন। বিবাহের প্রস্তাবপত্রের উত্তরে তিনি সেসকল তরুণীকে কন্যাবাচক শব্দ দ্বারা সম্বোধিত করেন। এবং পুনর্বিবাহে তাঁর অসম্মতির কথা জানিয়ে দেন।

আর্থিক অবস্থা-

পণ্ডিতজীর আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিলো না। একবার পণ্ডিতজীর বাড়িতে এক অন্য ধর্মাবলম্বী পুলিশের প্ররোচনায় চুরির ঘটনা ঘটে। সেসময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো যে তাঁর শাক কেনার মতো টাকাও ছিলো না। তখন ঘরে রাখা পুরানো পত্রিকার স্তূপ বিক্রি করে অল্পসংস্থান করতে হয়েছিলো। এছাড়া পণ্ডিতজী জীবনে এমন সময়ও পার করেছেন যে, আর্থিক দুরাবস্থার কারণে দুবেলা ভরপেট ভোজনও করতে পারতেন না। সকালে তিনি একটি লাড্ডু আর আধা সের দুধ পান করে দোকানে যেতেন। সারাদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় দোকানে কাজ করে সন্ধ্যায় এসে খাবার খেতেন। জীবনের এমন দুঃসময়েও পণ্ডিতজী নিরন্তর ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন। যখন প্রচারের (ভাষণ, ব্যাখ্যানের) জন্য কোথাও যেতে হতো তখন তিনি ভাড়ার সম্পূর্ণ খরচ নিজের পকেট থেকে ব্যয় করতেন। কিছু সন্ন্যাসী মহাত্মরা তাঁকে এমন না করার জন্য আদেশ দেওয়ায় তিনি এটা বন্ধ করেন।

ধার্মিক জগতে পদার্পণ

নিজের অত্যন্ত কষ্টকময় পারিবারিক জীবনের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও পণ্ডিতজী কখনো নিজের উদ্যম হারান নি। এতো দুঃখ কষ্টের দিনেও তিনি বিদ্যাচর্চা তথা ধর্মীয় পুস্তকাদি অধ্যয়ন থেকে বিরত না হয়ে নিরন্তর শাস্ত্রচর্চা চালিয়ে যেতেন। কিন্তু বিধি যেন তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিলো। বারবার বিভিন্ন আঘাতে তাঁকে পথচ্যুত করতে চাইছিলো। পণ্ডিতজীও নাছোড়বান্দা। টানা ছয় মাস পণ্ডিতজীর চোখে এক বিষম রোগ হয়, তখন তিনি চোখে পট্টা বেধে বসে তাঁর শ্যালক মহাশয়ের দ্বারা বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করিয়ে তা শ্রবণ করতেন। এভাবে তিনি নিজের স্বাধ্যায় অব্যাহত রাখেন।

খ্রিস্টান ও মুসলমানদের প্রতিরোধ

দিল্লীর ফক্বারায় সপ্তাহে দুইদিন মুসলমান এবং সপ্তাহে দুইদিন খ্রিস্টানরা নিজেদের ধর্ম প্রচার করত। পণ্ডিতজী প্রায়ই তাদের ভাষণ শুনতে যেতেন। সেখানে সনাতন ধর্মের প্রতি ঈসায়ী পাদ্রী ও মোল্লাদের আঘাত ও অগুণতি মিথ্যাচার শুনতেন। এসব শুনে শুনে পণ্ডিতজীর স্বাভিমानी মন জ্বলে উঠে। তিনি

নিজে নিজেকে বললেন, "আরে! তোর এতো স্বাধ্যায় দিয়ে কি লাভ? সব বেকার পড়ে আছে!" সপ্তাহে মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের ২+২=৪ দিন এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাদে আরো দুইদিন সময় ছিলো। তিনি সেই দুইদিন সনাতন বৈদিক ধর্ম বিষয়ক বক্তব্য দিবেন বলে মনস্থির করলেন এবং পুলিশকেও এ বিষয়টি জানিয়ে দেন। যে রাতে তিনি পরের দিন ব্যাখ্যান দেওয়ার জন্য মনস্থির করেন সে রাতে তিনি উত্তেজনাবশত ভালোভাবে ঘুমোতে পারেন নি। পণ্ডিতজীর ধর্মপত্নী কমলাদেবী তখন জীবিত ছিলেন। পণ্ডিতজীর এমন অস্থিরতা দেখে তিনি তার কারণ জিজ্ঞেস করেন, পণ্ডিতজী তাঁকে সব বলেন। সেসময় পণ্ডিতজীর এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কমলাদেবী ততোটা ভালোভাবে না বুঝলেও সর্বদা তাঁর এই চেষ্টায় সহায়িকা হয়েছিলেন। পরের দিন পণ্ডিতজী ফব্বারায় নিজের বক্তৃতা দেন। ব্যাখ্যানের পূর্বে তিনি আধা ঘণ্টা ভজনও গায়ন করতেন। ব্যাস! এই নিয়ম চালু হয়ে গেলো। পণ্ডিতজী রোজ ট্রামযোগে ফব্বারায় গিয়ে মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের অপপ্রচারমূলক মন্তব্যসমূহকে নোট করে নিয়ে আসতেন এবং নিজের বক্তৃতার দিনে এসব অপপ্রচারের কঠোর খণ্ডন করে বৈদিক ধর্মের মাহাত্ম্য উপস্থাপন করতেন। তাঁর স্বাধ্যায় অগ্নির ভীষণ প্রতাপের সামনে বাঘা বাঘা মুসলমান এবং খ্রিষ্টান আলেমদের বড়াই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মাহফিল বসিয়ে সনাতন ধর্মের বদনাম করার দিনও শেষ হয়ে যায়। সমগ্র দিল্লীতে পণ্ডিতজীর সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মের পতাকা উড়তে থাকে।

পণ্ডিতজীর একেকটা ব্যাখ্যানে শ্রোতার সংখ্যা এতো বেশি ছিল যে, যেখানে ব্যাখ্যানের আয়োজন করা হতো সেখানে এতো মানুষের সংকুলান হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়তো এ কারণে পুলিশ গান্ধী গ্রাউন্ডে ব্যাখ্যানের স্থান করে দেয়। পণ্ডিতজীর এই ব্যাখ্যান কার্যক্রম কখনো কখনো সপ্তাহে ছয় দিন পর্যন্ত এবং টানা ১৫ বছর (সন্ ১৬১০-১৬২৫ পর্যন্ত) ধরে চলেছিল। আশ্চর্যের কথা এই যে এতো দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যাখ্যানের ধারাবাহিকতার কোনো ব্যতিক্রম নেই। যদিও পণ্ডিতজীর পুত্র এবং কর্তব্যপরায়ণ ধর্মপত্নী কমলাদেবীর মৃত্যুও তাঁর ব্যাখ্যানের জন্য নির্দিষ্ট দিনেই হয়েছিলো। এমন অসামান্য উদাহরণ অন্য কোনো বিদ্বানদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। একটানা ১৫ বছর ধরে প্রবচন দিয়ে যাওয়া পণ্ডিতজীর নিজস্ব রেকর্ড। যা আর কেউ গড়তে পারেননি। ভাঙ্গা তো অতি দুরূহ। এর মাধ্যমে আমরা পণ্ডিতজীর তুমুল জনপ্রিয়তা এবং সুযোগ্যতার অনুমান করতে পারি।

এসময়ে পণ্ডিতজীর বুদ্ধিমত্তা, অদ্ভুত তार्কিক শৈলী, অনুপম কার্য প্রণালী এবং পাণ্ডিত্যের তেজের কথা ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায় কোণায় ব্যাপ্ত হয়েছিলো। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্ম-প্রচারের জন্য পণ্ডিতজীর ডাক আসতে থাকে। দেশ এবং সময়ের দাবীর যথার্থতা বিবেচনায় রেখে পণ্ডিতজী ধর্ম প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করা আরম্ভ করেন।

অবৈদিক মতের অধ্যয়ন

সত্যকে জানাতে হলে মিথ্যাকে খণ্ডন করা আবশ্যিক। সেকালে সনাতন বৈদিক ধর্মের মহিমা খর্ব করার জন্য মোল্লা ও পাদ্রীরা উঠেপড়ে লেগেছিলো। এজন্য বেদপ্রচারের পাশাপাশি অবৈদিক মতাবলম্বীদের

প্রতিরোধ করাও জরুরি হয়ে পড়ে। এ কারণে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী থেকে শুরু করে আর্যসমাজের বিদ্বানগণ শুধু বৈদিক ধর্মের মহিমা প্রচার করে থেমে থাকেন নি বরং তাঁরা অসত্য ও ভ্রান্ত অবৈদিক মতের কঠোর খণ্ডন করে গেছেন। পণ্ডিত রামচন্দ্রজীও এই ধারার বিদ্বান। ফক্বারায় বক্তৃতা দেওয়ার দিনগুলোতে বৈদিক শাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি কুরাণ এবং বাইবেল অধ্যয়ন করেছিলেন। পণ্ডিতজীর কুরাণ পড়ার কাহিনি বেশ মনোমুগ্ধকর। তিনি তাঁর শ্বশুরের সামনে কুরাণ পড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে শ্বশুরজী তাঁর পরিচিত এক হাফেজের সাথে পণ্ডিতজীর সম্পর্ক করিয়ে দেন। হাফেজ সাহেব দিল্লিরই বাসিন্দা ছিলেন। তিনি পণ্ডিতজীকে কুরাণ পড়তে আগ্রহের কারণ জিজ্ঞেস করলে পণ্ডিত জী উত্তর দেন, সত্যের খোজ করার জন্য, সত্যকে জানার জন্য কুরান পড়তে চাই। হাফেজ সাহেব তাঁর উত্তর শুনে মনে মনে খুব খুশি হন এবং পণ্ডিতজীকে কুরাণ পড়ানো শুরু করে দেন। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াতেন। কারণ মুসলমানরা একজন অবিশ্বাসী অমুসলিমকে কোরাণ শেখানোর পক্ষে ছিলো না। আর রামচন্দ্রজী প্রসিদ্ধ তো ছিলেনই। তাঁর ব্যাপারে আরো প্রবল আপত্তি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কয়েকবার তো এমনও হয়েছে যে, মুমিনগণ কোনো কোনো হাফেজকে সন্দেহ করে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলো, "তুমি রামচন্দ্র দেহলবীকে কুরআন শরিফ পড়াও কি না?" যতক্ষণ না সেই হাফেজ ঈমান এবং ধর্মের কসম খেয়ে 'পড়াই না' বলতো ততক্ষণ তারা তাকে ছাড়তো না।

পণ্ডিতজী হাফেজকে কাছে করে নিয়ে আসতেন এবং পড়া শেষে আবার কাছে তুলে তার বাসায় দিয়ে আসতেন। পণ্ডিতজী হাফেজ সাহেবের নাম কখনো বলেননি কারণ তিনি জানতেন যে নাম বললে তাঁর উপর নানা বিপদ আসতে পারে।

পণ্ডিতজী হাফেজের কাছ থেকে দুই মাসে কোরাণ-শরিফ পড়া শেষ করেন। তাঁর ওস্তাদ হাফেজ পণ্ডিতজীর আয়াত পড়া শোনে প্রসন্ন হতেন। তিনি বলতেন আমি অনেক ভালো ভালো ছাত্র পেয়েছি, কিন্তু তোমার মতো সত্যিকারের সত্যবক্তা আর কাউকে পাইনি। পণ্ডিতজীর প্রথম বিতর্ক যেটি বাড়া হিন্দুরাওয়ে হয়েছিলো সেটি তিনি গোপনে শুনেছিলেন। পণ্ডিতজীর মুখে কোরাণের আয়াতের বিশুদ্ধ পাঠ শুনে তাঁর মন ভরে উঠে। কোরান পড়ার জন্য পণ্ডিতজী ১০ রুপি খরচ করেছিলেন।

আর বাইবেলের অধ্যয়ন পণ্ডিতজী নিজে নিজেই করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তকালয়ে হিন্দি ও ইংরেজী ভাষার অনেক কপি বাইবেল ছিল। তিনি এসব খুব ভালোভাবেই পড়েছিলেন।

শাস্ত্রার্থের শুরু

পণ্ডিতজী নিজের প্রথম শাস্ত্রার্থ এক মাওলানার সাথে করেন। এই শাস্ত্রার্থে জয়লাভ করে তিনি প্রসন্ন হন এবং সাথে তাঁর আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়ে যায়। সেইসাথে জনতাও পঞ্চমুখে পণ্ডিতজীর প্রশংসা করতে থাকে। তারা পণ্ডিতজীকে কলির অবৈদিক রাক্ষস সংহারী রামচন্দ্র রূপে পেয়ে যায়, যার অকাট্য তর্করূপী তীরের প্রহার সমস্ত অবৈদিক মতকে ছিন্নভিন্ন করে দিতো।

না জানি কতো শাস্ত্রার্থ সমাবেশ বসেছিলো যেখানে পণ্ডিতজী নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দণ্ড চূর্ণ করেছিলেন।

এই সমাবেশের মধ্যে একটির কাহিনী উল্লেখ করছি -

একবার মুজফফরপুরে শাস্ত্রার্থের আয়োজন করা হয়েছিলো। মুসলমানরা পণ্ডিতজীর বিপক্ষে ছিলো। তো প্রতিপক্ষের থেকে এমন প্রস্তাব এলো যে শাস্ত্রার্থে হার-জিত নির্ণয়ের জন্য একজন জজ কে রাখা হোক। পণ্ডিতজী তাদের এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নেন এবং জজকে নিয়ে আসার দায়িত্ব তাদেরকেই দিয়ে দেন। পরের দিন তারা নিজেদেরই এক রেভারেণ্ড জুডাহসাহেবকে জজ বানিয়ে নিয়ে আসে। আর সেই জজ এসে মুসলমানদের সাথেই বসে যান।

পণ্ডিতজীকে যখন একথা জানানো হলো তখন তিনি জজকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "জজসাহেব তো দেখছি এখন থেকেই একদিকের পক্ষ নেওয়া শুরু করেছেন। আপনি যেমন মুসলমান পক্ষের জন্য বিচারক তেমন আমারও বিচারক তাই না? সুতরাং আপনার দু পক্ষের মধ্যস্থলে বসা উচিত।" পণ্ডিতজীর একথার উপরে জজের কিছুই বলার ছিলো না তাই তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে মধ্যভাগে এসে বসেন। তারপর জজসাহেব এই মর্মে দুই পক্ষের সাক্ষর নিয়ে নিলেন যে, জজসাহেব কে তারা মান্য করেন এবং তার বিচারও উভয়পক্ষের জন্য মান্য।

দৃশ্য দেখার মতো ছিলো। জনতার উপচে পড়া ভীড় ছিলো। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। সবাই বিতর্ক শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো। কখন উত্তর-প্রত্যুত্তর আর যুক্তির ঘাত প্রতিঘাত শুরু হবে? সবাই এই প্রতীক্ষায় ছিলো। অবশেষে শাস্ত্রার্থের সময় এসে গেল। যেভাবে সিংহ সামনে শিকার কে দেখে খুশি হয় সেভাবে পণ্ডিতজীও খুশিমনে প্রতিপক্ষের দিকে তাকালেন। তিনি বিরোধীদের চালের অপেক্ষা করছিলেন, যে কখন তারা যুক্তি দিবে এবং তিনি সেই যুক্তিগুলোকে ধ্বংস করে দিবেন।

শাস্ত্রার্থ শুরু হলো। প্রথমে বিরোধীদের আক্ষেপের সময় দেওয়া হল। তারা যা যা আক্ষেপ করেছিল, পণ্ডিতজী প্রবল তর্কযুক্ত বাক্যের দ্বারা সেসব আক্ষেপের খণ্ডন করলেন। তাঁর বক্তব্য বেদ এবং কুরানের বহুল প্রমাণ দ্বারা পরিপুষ্ট এবং সবল ছিলো। তিনি নিজের প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুনে তাদের সামর্থ্য সম্পর্কে ধারণা করে নেন এবং প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রশ্ন করার সময় তিনি এমন সব প্রশ্ন করতে লাগলেন যে তাতে প্রতিপক্ষের বিতর্কিত মাওলানা সাহেবদের কলিজার পানি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারা না তো পণ্ডিতজীর বক্তব্যের উত্তর দিতে পারলেন আর না তো তাঁর খণ্ডন কিংবা কোনো গ্রন্থের প্রমাণ।

এখন জজ জুডাহ সাহেবের পালা। তবে জুডাহ সাহেব রায় দেওয়ার আগেই জনতা বুঝে গিয়েছিল যে, কে বিজয়ী হয়েছে? জনতার মধ্যে কোলাহল পড়ে গেল। সবাই রোমাঞ্চিত ছিলো এবং উৎসুক হয়ে জজ সাহেবের রায় শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলো।

জুডাহ সাহেব যখন রায় দেওয়ার জন্য যখন উঠে দাড়ালেন তখন চারিদিকের সব কোলাহল থেমে পিনপতন নীরবতার পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

তিনি বলতে শুরু করলেন, "আমি পুরো বিতর্কই শুনেছি, আর্থ পণ্ডিত যে ভাবে নিজের বক্তব্য দিয়েছেন। তা অসাধারণ ছিলো। অনেক আয়াতের দ্বারা ভরপুর তথা প্রমাণবহুল ছিলো। প্রতিপক্ষের উত্তরও

তিনি খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। (জনতার প্রবল হাততালি) এদিকে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা তাদের বক্তব্যে একটি আয়াতও উপস্থাপন করতে পারেননি। এজন্য আমার নির্ণয় হলো আর্থ পণ্ডিত জিতেছেন এবং মুসলমানরা হেরেছেন।"

পণ্ডিত রামচন্দ্র দেহলবী কি-জয়! মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কি- জয়! বৈদিক ধর্ম কি- জয়! জনতার এমন গগনভেদী জয়গান চারিদিক মুখরিত করে তোলে। জয়োল্লাসে মত্ত জনতা পণ্ডিতজীকে নিজেদের মাথার উপরে তুলে নেয়। পণ্ডিতজীও মনে মনে অনেক প্রসন্ন ছিলেন। পণ্ডিতজীর বিদ্বতার দ্বারা মুগ্ধ হয়ে একজন ধনী সজ্জন তাঁকে একটি সোনার পদক উপহার দেন।

পুরস্কারের কথায় আমার আরেকটি ঘটনা মনে হলো, একবার পণ্ডিতজী ফিরোজপুর আর্থসমাজের বার্ষিক উৎসবে অংশগ্রহণ করতে যান। তাঁর আসার কারণে সেখানে প্রচুর লোকসমাগম হয়। শাস্ত্রার্থ শোনার জন্য আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এক পাঠান নবযুবতীও এসেছিলো। পণ্ডিতজী কুরাণের আয়াতসমূহ এমন বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতেন যে তা শুনে বড়ো বড়ো হাফেজ মাওলানারাও বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেতেন। এই পাঠানকন্যাও পণ্ডিতজীর বাণীতে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলো। পণ্ডিতজীর আয়াত পড়া তার খুবই পছন্দ হয়। এবং সে পণ্ডিতজীকে "মৌলবী পণ্ডিত" বলে সম্বোধন করে, সেখানকার মন্ত্রীর কাছে তাঁর নামে পুরস্কারস্বরূপ ১০ রুপির একটি নোট দিয়ে দেয়। পণ্ডিতজী মজা করে এই ঘটনা শুনিয়ে বলতেন, আমার আরবি পড়ার খরচ মুসলমান সাহেবরাই দিয়েছিলো। আমি নিজের পকেট থেকে কিছুই খরচ করি নি। আপনাদের মনে আছে হয়তো পণ্ডিতজী কুরাণ শরীফ পড়ার জন্য সর্বমোট ১০ রুপিই খরচ করেছিলেন।

ইসলাম এবং খ্রিস্টান মতের পুস্তকের গহন জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পরেই পণ্ডিতজী পাদ্রী এবং মৌলবীদের সাথে শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি সব শাস্ত্রার্থে বিজয়ী হতেন। পণ্ডিতজীর করা শাস্ত্রার্থের সংখ্যা অনেক বেশি ছিলো। এবং এর সাথে পণ্ডিতজীর শাস্ত্রার্থসমূহ রুচিসম্মত, শিক্ষাপ্রদ এবং জনসাধারণের জন্য জ্ঞানবর্ধকও ছিলো। শাস্ত্রার্থে একের পর এক জয়লাভ করায় পুরো ভারতবর্ষের ধার্মিক জগতে পণ্ডিতজীর নামের ডংকা বাজতে থাকে। বেদ প্রচারের জন্য মনসা-বাচা-কর্মণা সমর্পিত পণ্ডিতজীকে পুরো দেশ থেকে শাস্ত্রার্থ এবং প্রবচনের জন্য ডাকা হয়। হায়দ্রাবাদে হিন্দুদের সংখ্যা প্রচুর ছিলো। আর্থসমাজের প্রভাবও সেখানে ভালো ছিলো। সেখানে আর্থসমাজের বৈদিক ধর্মের প্রচার এবং ব্যাখ্যানের কারণে হিন্দুদের মধ্যে অপূর্ব গণজাগরণ শুরু হয়। কিন্তু হায়দ্রাবাদের মুসলিম স্বৈরশাসক নিজাম, পণ্ডিতজীর প্রমাণ এবং সত্য মান্যতা যুক্ত প্রবচনের ভয়ে ভীত হয়ে হায়দ্রাবাদে তাঁর ব্যাখ্যানে দেওয়াতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

যখন পণ্ডিতজী মৌলভীর ভুল ধরে কানে ধরান-

এই ঘটনা আমার পুরোপুরি মনে নেই। তবে ঘটনা কিছুটা এমন যে, একবার আয়াত পড়ার সময় কুরআনের একটি শব্দ নিয়ে পণ্ডিতজীর সাথে এক মৌলভীর বিবাদ শুরু হয়ে যায়। এবং সেই বিবাদ চ্যালেঞ্জের রূপ নেয়। পণ্ডিতজী নিজের কাছে থাকা কোরআন শরিফ খুলে দেখিয়ে দেন যে তাঁর কথাই সঠিক এবং মৌলভী ভুল। মৌলভী বাধ্য হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং ভরা সভায় কান ধরেন। জনতা সভার মধ্যে হৈচৈ বাধিয়ে দেয় এবং বলাবলি করতে থাকে যে পণ্ডিতজী মৌলভী সাহেবকে কান ধরিয়ে দিয়েছেন।

ঝড়ো মানব

পণ্ডিতজী সময়ের প্রয়োজনে দ্রুততার সাথে কাজ করতেন। তিনি তার সাধারণ কাজও দ্রুত শেষ করতেন, সেভাবে প্রচার কাজও একই গতিতে করতেন। এককথায় তাঁর সব কাজে অসাধারণ গতি ছিলো। কি রাত? কি দিন? রোদ-ছায়াই বা কি? ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত! এই সব ছোটখাটো বিষয়কে তিনি কখনই পরোয়া করতেন না।

শুধুমাত্র হায়দ্রাবাদেই তিনি ৭ বারে ১২৫টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ থেকে আপনারা তাঁর প্রচারকার্যের গতি সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন।

সত্যগ্রহের নেতৃত্ব

পণ্ডিতজী যেমন আর্ঘ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও, সতন্ত্র হয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন। তেমনই আর্ঘ্য সমাজের দ্বারা করা প্রতিটি আন্দোলনে তিনি সৈনিকের মতো হয়ে কাজ করেছেন। তিনি চাইলে আর্ঘ্যসমাজের বিভিন্ন আন্দোলনের নেতাও হতে পারতেন। আর্ঘ্যসমাজ যখন কাইরন শাহীর বিরুদ্ধে হিন্দি আন্দোলন শুরু করে তখন তিনি সেই আন্দোলনে নেমে পড়েন। এবং একটি বড় দল নিয়ে সত্যগ্রহের জন্য পাঞ্জাবে যান।

পণ্ডিতজীর খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারা-

পণ্ডিতজীর জীবনচরণ তথা চালচলন অত্যন্ত সাদামাটা ছিল। খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি খুবই সাধারণ খাবার খেতেন। ঘরে তিনি সকালে শুধু রুটি এবং ডাল এবং সন্ধ্যায় শুধু শাক এবং রুটিই আহার করতেন। তিনি সম্পূর্ণ শাকাহারী এবং সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকাহারী ছিলেন। তাঁর ঘরে কখনো পেয়াজও খাওয়া হতো না। চা, পান, বিড়ি, সিগারেট এসব তো অনেক দূরের কথা। তাছাড়া তিনি নিজের পুরো জীবনে কখনো সিনেমা দেখেননি। পণ্ডিতজীর পরিধেয় কাপড় ছিলো অত্যন্ত সাদামাটা। তিনি সবসময় নিজের হাতে ধোয়া পরিস্কার জামাকাপড় পরতেন। শুধুমাত্র শেরওয়ানি ইস্ত্রি করে পরতেন। পণ্ডিতজী অত্যন্ত সাদামাটা এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কিন্তু মিথ্যা এবং কুটিল কথাবার্তা তিনি সহ্য

করতেন না । রেগে গেলে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিতেন না । মনের দিক দিয়ে অবশ্য অনেক কোমল ছিলেন । দোষী ব্যক্তি যদি তার সামনে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে নিত তাহলে তার সকল রাগ উধাও হয়ে যেত এবং দয়াদ্র হৃদয়ে দোষীকে ক্ষমা করে দিতেন । এছাড়া পণ্ডিতজী খুবই দূরদর্শী এবং গম্ভীর বিচারক ছিলেন । যেকোনো সমস্যাকে ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করার পরেই তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন । এবং কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যাই হোক না কেন সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন না । শিশুদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন । সন্তানাদির কষ্টে তিনি অনেক দুঃখিত হতেন । তাদের দুঃখ দূর করার জন্য নিজের সামর্থ্য অনুসারে যা যা করা সম্ভব সবই তিনি করতেন । সেবা অনেক কঠিন এবং অনেক কষ্টকর কাজ । সেই সেবাকার্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন । সেবা করতে গিয়ে যেকোনো দুর্গন্ধযুক্ত কাজে তিনি কখনো ঘৃণাবোধ করে সরে আসতেন না । যেখানেই সেবা করার সুযোগ পেতেন সেখানেই তিনি সেবা করতেন । পণ্ডিতজী বলতেন, "Every opportunity to help is a duty." আমাদের কর্তব্য হলো যখনই সেবা কার্যের সুযোগ সুযোগ আসবে তখন সেটা থেকে পিছিয়ে না যাওয়া ।

ধার্মিক ক্ষেত্রে অপূর্ব সফলতা লাভ

পণ্ডিতজীর সময়ে আর্যসমাজে পণ্ডিতজীর সমকক্ষ অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত ও বেদশাস্ত্রের বিদ্বান ছিলেন । কিন্তু তাঁরা পণ্ডিতজীর মতো লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি । কারণ পণ্ডিতজীর মধ্যে বহু অসাধারণ গুণের সমাহার ছিলো যা অন্যদের মধ্যে ছিলো না । পণ্ডিতজী নিম্নলিখিত বিশেষতার কারণে অন্যদের চেয়ে অধিক এবং অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়েছিলেন-

- ১/ সব ধর্মমত ও সিদ্ধান্তের শাস্ত্রসমূহের গভীর অধ্যয়ন ।
- ২/ নিজের বোঝা কথাকে জনসাধারণের বুদ্ধি স্তর অনুযায়ী তাদের ভাষায় ভালোভাবে বোঝানোর ক্ষমতা ।
- ৩/ বিধর্মীদের সিদ্ধান্তের খুঁত বা দোষসমূহ যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বোঝাতেন । কখনো তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ বা তাদের অপমান, তিরস্কার বা লজ্জিত করতেন না ।
- ৪/ অন্য ধর্মাবলম্বীদের আলীম বা ধর্মগুরু নেতাদের নিয়ে কখনো অপশব্দ উচ্চারণ করেননি বরং তাদের নাম পূর্ণ সম্মানের সাথে নিতেন ।
- ৫/ তাঁর জ্ঞান অসীমিত বা সম্পূর্ণ ছিলো । তিনি কখনোই সন্দেহাত্মক কথা বলতেন না । সব কথা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতেন ।
- ৬/ বৈদিক জীবন সিদ্ধান্তকে তিনি স্বয়ং নিজের মধ্যে ধারণ করে তদানুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করতেন । এবং যেহেতু তিনি পূর্ণ বৈদিক হয়েই মানুষকে বৈদিক ধর্মোপদেশ দিতেন সুতরাং তাঁর আচরণের উপর আঙ্গুল উঠানোর কোনো অবকাশ ছিলো না । এজন্য জনসাধারণ তাঁর কথা শীঘ্রই মেনে নিতো ।

পণ্ডিতজীর রুগ্নাবস্থা ও দেহাবসান

একবার দিল্লির সদরে যাওয়ার সময় পণ্ডিতজী যে রিক্সায় ছিলেন ওটার পেছনে এক ট্যাক্সিওয়ালা জোরে ধাক্কা দেয়। পণ্ডিতজী রিক্সা থেকে ছিটকে পড়েন। এবং খুব আহত হন। তাঁর মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তখন থেকে পণ্ডিতজীর বাম হাতে কম্পন হয়ে যায়। পণ্ডিতজী প্রথমে এর উপর ততোটা মনোযোগ দেননি কিন্তু এটা বাড়তেই থাকে। ধীরে ধীরে স্নায়ু-দুর্বলতাও বাড়তে থাকে। পরে চিকিৎসা করিয়েও লাভ হয়নি। তিনি এতোটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে চলাফেরা করাও তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। ঘরের বিভিন্ন স্থানে দড়ি বেধে সেসব ধরে ধরে তিনি চলাফেরা করতেন। এই দুর্বল অবস্থা দ্রুত বাড়তে থাকে। এরপর থেকে পণ্ডিতজী শারিরীক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যান। তাঁকে প্রথমে নার্সিং হোম এবং পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল থেকে পুনরায় নার্সিং হোম এ নেওয়া হয়। পণ্ডিতজীর শারিরীক অবস্থার কখনো উন্নতি কখনো বা অবনতি হতে থাকে। কখনো তিনি অচেতন হয়ে যেতেন। সেসময় শ্রী বিমলচন্দ্রার্য ও তার পরিবার পণ্ডিতজীর পাশে ছিলেন। পণ্ডিতজীর কন্যা শ্রীমতি কস্তুরি দেবীও তাঁকে দেখতে আসতেন। ডাক্তারি চিকিৎসা চলতে থাকে। ডাক্তার পণ্ডিতজীকে পরীক্ষা করে বলেন যে তাঁর নিউমোনিয়া হয়ে গেছে। ২ ফেব্রুয়ারী পণ্ডিতজীর অসুখ আরো বেড়ে যায়। তাঁর পেটও খারাপ হয়ে যায় যার কারণে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। মৃত্যু ধীরে ধীরে পণ্ডিতজীকে গ্রাস করতে থাকে। সর্বথা অপরাজেয় বীর আজ যেন মৃত্যুর সম্মুখে নত হলেন। এই রাত থেকেই পণ্ডিতজীর শরীর থেকে প্রাণবায়ু বের হয়ে যেতে থাকে। তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গে কম্পন শুরু হয়। আর্ঘ্য জগতের মহান পৃষ্ঠপোষক আজ সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সবাই যেন শোক সাগরে ডুবে ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এই ভীষণ দুঃখময় সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। আর পণ্ডিতজীর জীবিত থাকার আশাও সেই অন্ধকারে লীন হতে থাকলো। বসন্তপঞ্চমীর এই রাত আর্ঘ্য জগতের জন্য মহা দুঃখের রাত ছিলো।

দেহত্যাগ

পণ্ডিতজীর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অস্বাভাবিক হতে লাগলো। ডাক্তার ডেকে আনা হলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে সবই দেখলেন কিন্তু কিছুই দেখলেন না। কেবল তাঁর মরণই দেখতে পেলেন। "ব্যাঃ! সবকিছু বন্ধ করে দাও, পণ্ডিতজীকে যেতে দাও, থামিয়ে না। তাঁর আত্মাকে আর কষ্ট দিও না।" এই বাক্য বলে ডাক্তার মহাশয়ও সবার সাথে শিশুদের মতো কান্না করতে লাগলেন। তিনি বললেন, সাড়ে নয়টায়ই পণ্ডিতজী অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করেছেন। চিৎকার! চারিদিকে ভয়ংকর চিৎকার!

পণ্ডিতজীর দেহত্যাগের তারিখ ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ ইংরেজি। এবং মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিলো ৮৭ বছর।

শব যাত্রা

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তে পণ্ডিতজীর দেহত্যাগের সংবাদ সমগ্র দিল্লিতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ৪ ফেব্রুয়ারি সকালে এই সংবাদ রেডিওতে প্রচার করা হয়। আজও সমাজে মন্দিরে শোকাবুল অবস্থায় সকাল সাড়ে আটটার দিকে পণ্ডিতজীর শবদেহ জনসাধারণের দর্শনের জন্য রাখা হয়।

সাড়ে এগারোটা বাজার কিছুক্ষণ পূর্বে পণ্ডিতজীর শব যাত্রা শুরু হয়। দিল্লির বড় বড় সামাজিক কার্যকর্তা, সংসদ সদস্য, কংগ্রেস ও জনসংঘের নেতৃবৃন্দ এই শব-যাত্রায় সম্মিলিত হয়েছিলেন। আর্যসমাজীগণ শোকাবুল অবস্থায় নিজেদের সাপ্তাহিক সংসদের কার্যক্রম বন্ধ করে পণ্ডিতজীর অন্তিম যাত্রায় সম্মিলিত হন।

পণ্ডিতজীর শবদেহ জাফরান কাপড়ের দ্বারা আবৃত ছিল। শুধু মুখ খোলা তথা অনাবৃত ছিল। জাফরান কাপড়ের উপর ॐ 'ओ३म्' খচিত পতাকা রাখা হয়েছিলো। ('ওতম্' কার তিনি জীবনভর উচ্চারণ করতেন। কখনো কখনো অচেতন অবস্থায়ও উচ্চারণ করতেন।) ফুলের মালায় পুরো শবদেহ ঢেকে ছিলো।

শব যাত্রা 'চাদনী চৌক', 'এম্পলেনেড রোড', 'দরীবা', 'ফব্বারা', 'কৌড়ীয়া পুলের নিকটস্থ কাশ্মীরী গেট', বড়ো ডাকখানার সামনে দিয়ে নিগমবোধ ঘাটে পৌঁছেছিলো। শব যাত্রার সাথে এখানে হাজারো দিল্লীবাসী সম্মিলিত হয়েছিলেন। নিগমবোধ ঘাটে একটুও জায়গা ছিলো না। কারণ হাজার হাজার লোক পণ্ডিতজীকে শেষবারের মতো দেখার জন্য নানান জায়গা থেকে সেখানে এসে পৌঁছেছিলো। এতে নিগমবোধ ঘাটে ভীড় সামলানো কষ্টকর হয়ে যায়।

পণ্ডিতজী মৃত্যুর কয়েক বছর আগে নিজের কন্যা শ্রীমতি লীলাবতী দেবীকে নিজের অন্তিম সংস্কারের জন্য ৫০০ রুপি দিয়ে গিয়েছিলেন। এই রাশি লালারামগোপালজীর আদেশে শ্রী বৈদ্য প্রহ্লাদ দত্ত জীকে দেওয়া হয়।

ঠিক দেড়টায় পণ্ডিতজীর শব বেদীতে রাখা হয়। যখন পণ্ডিতজীর শবদেহ দাহ করা হচ্ছিলো, হাজার হাজার মানুষের চোখ তখন অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিলো। দিল্লির মূর্খন্য পণ্ডিতবর্গের দ্বারা পূর্ণ বৈদিক পদ্ধতিতে তাঁর দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

পণ্ডিতজীর লেখন কার্য

পণ্ডিত রামচন্দ্র দেহলবী আৰ্য সমাজের সাহিত্যিক ভাণ্ডারেও নিজের জ্ঞানপূর্ণ লেখনীর দ্বারা মহত্বপূর্ণ যোগদান করেছিলেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও লেখনীসমূহ হলো-

1- দো সনাতন সত্তায়ें, (দুই সনাতন সত্তা)

2- सत्यार्थप्रकाश के चतुर्दश समुल्लास में उद्धृत कुआन की आयतों का देवनागरी में उल्था और अनुवाद (सन् 1945), (সত্যার্থ প্রকাশের চতুর্দশ সমুল্লাসে উদ্ধৃত কোরানের আয়াতসমূহের দেবনাগরীতে প্রতিবর্ণীকরণ ও অনুবাদ।- সন ১৯৪৫)

3- ईश्वर सिद्धि, (ঈশ্বর সিদ্ধি)

4- ईश्वरोपासना, (ঈশ্বরোপাসনা)

5- धर्म और अधर्म, (ধর্ম এবং অধর্ম)

6- ईश्वर में अविश्वास क्यों?, (ঈশ্বরে অবিশ্বাস কেন?)

7- विद्यार्थी और सदाचार, (বিদ্যার্থী এবং সদাচার)

8- ईश्वर की पूजा का वैदिक स्वरूप, (ঈশ্বরের পূজার বৈদিক স্বরূপ)

9- इंजील के परस्पर विरोधी वचन, (ইঞ্জিলের পরস্পর বিরোধী বাক্য)

10- पौराणिकों से शास्त्रार्थ का विषय निश्चित करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, (পৌরাণিকদের সাথে শাস্ত্রার্থের বিষয় নিশ্চিত করার সময় খেয়াল রাখার যোগ্য কথা)

11- कुआन में अन्य मतावलम्बियों के लिये कुछ अति कठोर, उत्तेजक वाक्यों का संग्रह (1944), (কুরানে অন্য মতাবলম্বীদের জন্য অতি কঠোর উত্তেজক বাক্যের সংগ্রহ)

12- आर्यसमाज की मान्यतायें, (আর্যসমাজের মান্যতাসমূহ)

13- आर्यसमाज के मन्तव्य, (আর্যসমাজের মন্তব্য)

14- कुरान का अनुवाद (सूर ए बकर और सूर ए फातिहा), (কুরানের অনুবাদ- সূর এ বকর এবং সূর এ ফাতিহা)

15- रामचन्द्र देहलवी लेखावली (1968), (রামচন্দ্র দেহলবীর রচনাসমগ্র)

16- ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई?, (ঈশ্বর কেন এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন?)

17- पूजा क्या, क्यों और कैसे? (পূজা কি কেন এবং কিভাবে?)

18- वेद का इस्लाम पर प्रभाव। (ইসলামের উপর বেদের প্রভাব)

19- शंका समाधान। (শংকা সমাধান)

তথ্যসূত্র - বিমলচন্দ্রার্য ও অন্যান্য উৎস।

নিবেদক-

বিদুষামনুচরঃ

শ্রী সুব্রত দেবনাথ



মৃত্যুর সময় কে সঙ্গী/সহায়ক হবে?

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ঠসমং ক্ষিতৌ ।
বিমুক্তা বান্ধবা মান্তি ধর্মস্তুমনুগচ্ছতি ॥
মনুস্মৃতি (৪।২৪১)

যখন কাহারও কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তখন তাকে কাষ্ঠখণ্ড ও মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া যায়, বন্ধুগণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করে। কেহই তাহার সহিত যাইতে চায় না। কিন্তু একমাত্র ধর্মই তাহার সঙ্গী হইয়া গমন করে।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতিধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥
মনুস্মৃতি (৪।২৩৯)

পরলোকে মাতা-পিতা, পুত্র, স্ত্রী এবং জ্ঞাতি কেহই সহায়তা করিতে পারে না, কিন্তু ধর্মই একমাত্র সহায়ক হইয়া থাকে।



What is the importance of Manusmriti in Vedic tradition?

Nishant Arya

Today many people get irritated with Manusmriti of Maharishi Manu, but in the Vedic system it was considered and understood to be very important for the Varnashram system after the Vedas.

The main reason for this happening was because Maharishi Manu was a great scholar of Vedas in his time, That's why all the sages of that time came in front of Maharishi Manu to request him that you are the knower of the Vedas, so preach us the Varnashram system which is according to the purpose of the Vedas.

Therefore, after accepting the request of the sages, whatever teachings Maharishi Manu gave regarding Varnashram became famous as Manusmriti, being important for the Varnashram system.

For these reasons, Manusmriti was accepted as a scripture under Sanatan Dharma, which was followed by great personalities like Shri Ram and Krishna and made themselves superior.

It has been said in the Taittiriya Samhita 2.2.10.2 that

मुनवैर यत्किञ्चावदत् तद् भेषजम्

This means that what Manu has said is as beneficial for humans as food, This proves that Manu's theology was considered to be the most authentic in the ancient Vedic period.

The same thing is found in Tandyabrahmin in 23.16.9. Several Maharishi's have written sentences containing many such expressions in their books regarding Manusmriti, this proves that Manu's theology was prevalent, In vedic period , In the Valmiki Ramayana, when Ramji killed Bali on the occasion of mutual war between Bali and Sugriva, the injured Bali denies Ram's act inappropriate, Then Ram ji uses the words of Manusmriti to justify his act and recites 2 verses of Manu Smriti.

The verses that Ramji quotes are found in 8.396,318 from a few lessons in the present Manusmriti, Maharishi Manu has been described as a special memory on several chapters in the Mahabharata, For example, in Shantiparva, we can see places like -3.3.3, 57.33, 118.26, 121.10.

The Acharya named Brihaspati has declared Manusmriti to be the highest smriti

scripture in clear words in his smriti shastra.

Proclaiming his authenticity and importance, he writes- Sanskarakhanda- 13.14

The meaning of the sentence of Acharya called Brihaspati - Manusmriti is the most prominent and praiseworthy among all the Smriti Shastras because of the Vedas being composed in a friendly way to the mantras. And unlike Manu, the scripture is not worthy of praise, In the same way, there are enough examples of Adyashankaracharya Manusmriti in the Vedantasutra commentary, Vedanta Bhasya - 1.3.28, 36; 2.1.1, 11; Similarly, Maharishi Dayanand Saraswati has adopted many proofs of Manusmriti in the six chapters of his famous book Satyarth Prakash.

It is proved from all these evidences that Manusmriti was considered by all people as authentic. And used to follow it, In the Vedic period, everyone believed Manusmriti from Satyuga to Mahabharata period.

All Acharyas and Rishimuni people believed, What does it mean? That we should not get irritated with Manusmriti, rather we should follow all those verses of Manusmriti which are in favor of Vedas.

বাংলাদেশ অগ্নিবীরের স্বাধ্যায় প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত ৩টি অমূল্য গ্রন্থ

বেদসার-আহ্বান-বেদামৃতবিন্দু

বেদসার-১৬০ টাকা; আহ্বান- ৫০ টাকা; বেদামৃতবিন্দু- ৯০ টাকা
কুরিয়ার চার্জ- ৫০ টাকা

সংগ্রহ করতে এখনই কল করুন

01786-659164; 01822-310609; 01673-012197



For more details- www.facebook.com/bangladeshagniveerofficial



সামবেদের আলোকে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

সত্রাহণং দাধৃষিৎ তুশ্মিন্দ্রং মহামপারং বৃশভং সুবজ্রম্ ।
হস্তা যো বৃত্রং সনিতোত বাজং দাতা মঘানি মঘবা সুরাধাঃ ॥

সামবেদ ৩৩৫

ওঁ ঈশ্বর্যবান উৎকৃষ্ট ন্যায় ও ধর্মরূপ ঈশ্বর্যযুক্ত যে পরমাত্মা
ওঁ বিঘ্নভূত শত্রুদের বিনাশক এবং অন্ন, বল, বিজ্ঞান প্রভৃতির বণ্টন করে ঈশ্বর্য দান করেন, সেই
ওঁ সত্য দ্বারা অসত্যের খণ্ডনকারী,
ওঁ পাপ এবং পাপীদের অতিশয় বিনষ্টকারী,
ওঁ শুভ কর্মের প্রেরণাদাতা,
ওঁ মহান,
ওঁ অপার অর্থাৎ অনন্ত বিদ্যায়ুক্ত,
ওঁ সুখের বর্ষণকারী,
ওঁ উৎকৃষ্ট দণ্ডশক্তিদ্বারী,
ওঁ অধর্ম, অবিদ্যা প্রভৃতির বিদারক
পরমাত্মাকে আমরা উপাসনা করি ॥

ত্রাতারমিদ্ৰমবিতারমিদ্ৰং হবেহবে সুহবং শূরমিদ্ৰম্ ।
হবে নু শত্রুং পুরুহুতমিদ্ৰমিদং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ ॥

সামবেদ ৩৩৩

আমি

ওঁ সকল বিপত্তি থেকে পরিত্রাণকারী পাপ প্রবৃত্তিরূপ শত্রুবিদারক জগদীশ্বরকে,
ওঁ সুখাদির প্রদান দ্বারা পালনকারী ঈশ্বর্যবান জগদীশ্বরকে,
ওঁ প্রত্যেক সংগ্রামে, প্রত্যেক সংকটে সরলভাবে আহ্বানের যোগ্য শক্তিশালী,
ওঁ বহুবিধভাবে স্তুতিকৃত অথবা বহুজনের দ্বারা আহৃত
ওঁ অবিদ্যা, দুঃখ আদির ভঞ্জন জগদীশ্বরকে
শীঘ্রই আহ্বান করি । সেই প্রশস্ত ঈশ্বর্যবান জগদীশ্বর এই আমার দ্বারা উৎসর্গীকৃত আত্মসমর্পণ,
মনসমর্পণরূপ হবি গ্রহণ করুন ॥

তম্ যু বাজিনং দেবজুতং সহোবানং তরুতারং রথানাম্ ।
অরিষ্টনেমিং পুতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তাস্ক্যমিহা হুবেম ॥
সামবেদ ৩৩২

আমরা সেই

- ওঁ সকল অন্ন বা ঐশ্বর্যের অধিপতি, বিদ্বান যোগীগণকে প্রাপ্ত অথবা
ওঁ প্রকাশক সূর্য, চাঁদ প্রভৃতি তথা মন, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত,
ওঁ সাহসী, বলবান শরীররূপ রথের অথবা
ওঁ গতিশীল পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি লোকের পরিচালনাকারী,
ওঁ অপ্রতিহত জীবনচক্র বা প্রগতিচক্র দাতা,
ওঁ কাম-ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির সেনাদলকে দূরকারী অথবা তাদের ওপর বিজয় লাভকারী এবং
ওঁ সত্য, দয়া, উদারতা প্রভৃতি সদগুণের সেনাদলকে প্রাপ্তকারী, শীঘ্রকারী,
ওঁ বিস্তীর্ণ জগতে নিবাসকারী,
ওঁ সকল ভূবনব্যাপী,
ওঁ প্রাপ্তব্য

পরমাত্মাকে নিজেদের এই জীবনে কল্যাণের জন্য সম্যকরূপে আহ্বান করি ।



চরণ স্পর্শ প্রণাম ও পাদপ্রক্ষালন মীমাংসা

বাংলাদেশ অগ্নিবীর আয়োজিত উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠানে শিষ্যকর্তৃক আচার্যের পাদপ্রক্ষালন ও প্রণামের দৃশ্য দেখে অনেকেই বলেছেন এসব কর্ম বৈদিক শাস্ত্রের পরিপন্থী, অগ্নিবীর বৈদিক শাস্ত্র প্রচারের নামে পৌরাণিক কুসংস্কারপূর্ণ সংস্কৃতি প্রচার করছে। এই সকল মহাজ্ঞানীরা স্বাধ্যায়হীনতার অকালপ্রভাবে বিদ্যাদাতা আচার্য-সেবাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন। তাই সকলের অবগতির জন্য শাস্ত্রীয় মীমাংসা তুলে ধরা হলো:

- * মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী স্বীয় বেদভাষ্যে নিচু হয়ে নমস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়-“যেষাং পিতরো যদা সামীপ্যমাগচ্ছেয়ুঃ স্বয়ং বৈতেষাং নিকটে সমভিগচ্ছেয়ুস্তদা ভূমৌ জানুনী নিপাত্য নমস্কৃত্যৈতান্ প্রসাদয়েয়ুঃ” অর্থাৎ পিতৃগণ (পিতার বয়সী, আচার্য, গুরুজন) যখন সমীপ আসিবে অথবা সন্তানগণ যখন তাদের সমীপ যাইবে তখন ভূমিতে হাঁটু মুড়িয়া নমস্কার করিয়া ইহাদের প্রসন্ন করিবে (যজুর্বেদ: ১৯/৬২)।
- * মনুস্মৃতিতে (২/৭২) আচার্যের চরণ স্পর্শ করে প্রণামের উল্লেখ রয়েছে। বলা বাহুল্য শ্লোকটি বিশুদ্ধ মনুস্মৃতিতে মৌলিক হিসাবে গৃহীত হয়েছে-“ব্যতস্তপাণিনা কার্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ। সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ।।”
- * মনুস্মৃতিতে (২/৭১) আচার্যের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করাকে ‘ব্রহ্মাঞ্জলি’ বলা হয়েছে-“... ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ।।”
- * মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকর্তৃক গুরুদের চরণে প্রণামের উল্লেখ রয়েছে (সভাপর্ব, অধ্যায়: ৩৪; কালীপ্রসন্ন সিংহ। সভাপর্ব, অধ্যায়: ৩৫, শ্লোক: ১; গীতাপ্রেস। সভাপর্ব, অধ্যায়: ৭, শ্লোক: ১-২; স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, আর্ষ সমাজ)।
- * মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনের উল্লেখ রয়েছে (সভাপর্ব, অধ্যায়: ৩৪, কালীপ্রসন্ন সিংহ। সভাপর্ব, অধ্যায়: ৩৫, শ্লোক: ১০, গীতাপ্রেস। সভাপর্ব, অধ্যায়: ৭, শ্লোক: ৮; স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, আর্ষ সমাজ)।

- * রামায়ণে শ্রীলক্ষণকর্তৃক শ্রীরাম ও মাতা সীতার পাদপ্রক্ষালনের উল্লেখ রয়েছে (বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড, অধ্যায়: ৫০, শ্লোক: ৪৯, গীতাপ্রেস। অযোধ্যা কাণ্ড, অধ্যায়: ৩৮, শ্লোক: ২৭, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, আর্ষ সমাজ)।
 - * রামায়ণে শ্রীশঙ্করকর্তৃক শ্রীরামের চরণে প্রণতি নিবেদনের উল্লেখ রয়েছে (বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড, অধ্যায় ৯৯, শ্লোক: ৪০। অযোধ্যা কাণ্ড, অধ্যায়: ৬৯, শ্লোক: ১০, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, আর্ষ সমাজ)।
 - * রামায়ণে শ্রীসুগ্রীবকর্তৃক শ্রীরামের চরণে প্রণাম (বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, অধ্যায়: ৩৮, শ্লোক: ১৮, গীতাপ্রেস। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, অধ্যায়: ২১, শ্লোক: ১২, আর্ষমুনি, আর্ষ সমাজ)।
 - * আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১/২/৬/১) স্পষ্টভাবে পাদপ্রক্ষালনের আদেশ রয়েছে- “সদা নিশায়াং গুরুং সম্বেশয়েত্তস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য সম্বাহ।”
 - * বৈখানস ধর্মসূত্রে (২৯/১৬) ব্রহ্মজ্ঞানীদের পাদপ্রক্ষালনের আদেশ রয়েছে- “ব্রাহ্মণান্পাদৌ প্রক্ষাল্য...”
 - * মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীজী’র জীবনীতে গুরুমহারাজ স্বামী বিরজানন্দ দণ্ডীজীর চরণ স্পর্শ করে প্রণামের উল্লেখ পাওয়া যায়-(মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবন চরিত, পৃষ্ঠা: ৬৯, ঘাসীরাম; দয়ানন্দ প্রকাশ, পৃষ্ঠা: ৬২, স্বামী সত্যানন্দ)।
 - * শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৪/৩৪) জ্ঞানিগণকে প্রণাম, প্রসন্ন ও সেবাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের আদেশ করা হয়েছে- “তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।”
- সুতরাং আচার্যের পাদপ্রক্ষালন করে প্রণাম করা কখনোই অশাস্ত্রীয় নয়। পাদপ্রক্ষালন করে আচার্যের সেবা করে এবং প্রণাম করে পূর্ণ সমর্পনের মাধ্যমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তবে আচার্যের পাদপ্রক্ষালনের জল পান, কেশ স্নান ইত্যাদি অবৈদিক নিয়ম অনুসরণযোগ্য নয়।





ছেলে - মেয়ে পরস্পরকে পরীক্ষাপূর্বক বিবাহ করা উচিত কি না ?

- * সজ্জন ছেলের সজ্জন মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত যাতে উত্তম সন্তান এবং ঐশ্বর্য নিত্যবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । পত্নী সম্বন্ধ দ্বারা উৎপন্ন দুঃখের ন্যায় এই সংসারে অন্য কোন বড় কষ্ট নেই । এইজন্য পুরুষের পরীক্ষা করে উত্তম লক্ষণ যুক্ত নারীর সাথে বিবাহ করা উচিত আর নারীর হৃদয়ে প্রিয় এবং প্রশংসনীয় রূপ তথা গুণযুক্ত পুরুষকেই গ্রহণ করা উচিত । (ঋগ্বেদ ১।১১৩।১৯ ভাবার্থ)
- * সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে হৃদয়ে প্রিয় পতিকে কন্যার স্বীকার করা উচিত । (ঋগ্বেদ ৬।২২।৫ ভাবার্থ)
- * ব্রহ্মচর্য যুক্ত এবং বিবাহে ইচ্ছুক যুবতী কন্যা এবং যুবক পরস্পরে সম্পদের উন্নতি পরীক্ষা করে বিবাহ করবে। নাহলে ধনের অভাবে দুঃখ বৃদ্ধি লাভ করবে। এভাবে বিবাহ করে একে অপরকে আহ্লাদিত করার মাধ্যমে প্রতিদিন ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবে । (যজুর্বেদ ৮।১১ ভাবার্থ)
- * হে বিদ্বান ! হে বিদুষী ! তুমি আমাদের উত্তম পতি, উত্তম পত্নী ও শ্রেষ্ঠ ধন প্রাপ্ত করিয়ে উত্তম শিক্ষা দ্বারা ধর্মাচরণকে লাভ করাও । (ঋগ্বেদ ৬।৫৩।২ ভাবার্থ)



যজ্ঞের সমিধা কেন ৮ আঙুল হয় ?

আমরা দেবযজ্ঞে বা অগ্নিহোত্রে সমিধা বা কাঠ ব্যবহার করে থাকি। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সংস্কারবিধির ‘সামান্যপ্রকরণম্’ এর ‘যজ্ঞ সমিধা’ অংশে সমিধা সম্পর্কে বলেছেন -

“পলাশ, শমী, অশ্বথ, বট, যজ্ঞডুমুর, আম্র ও বিন্ধাদি কাষ্ঠ যজ্ঞকুণ্ডের পরিমাণ মত ছোট বড় করিয়া লইবে। পরন্তু এই সব সমিধা যেন কীট-দষ্ট, মলযুক্ত স্থানে উৎপন্ন এবং অপবিত্র পদার্থাদি দ্বারা দূষিত না হয়। উত্তমরূপে দেখিয়া লইবে এবং সমিধাগুলিকে কুণ্ডের চারিদিকে ও মধ্যভাগে পরিমাণ মত সমান করিয়া চারিদিকে সাজাইবে।”

এরপরে অগ্নিহোত্র বিধিতে ‘অগ্ন্যুদ্বোধন’ শেষে ‘সমিধাদান’ মন্ত্রের পূর্বে লিখেছেন -

“অগ্নি যখন সমিধাতে প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে, তখন চন্দনের বা উপরিলিখিত পলাশাদির অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত তিন খণ্ড কাষ্ঠ ঘৃতসিক্ত করিয়া তাহা হইতে নিম্নলিখিত এক একটা মন্ত্রে এক একটা সমিধা অগ্নিতে আস্থতি দিবে।”

প্রশ্ন হচ্ছে যজ্ঞে কেন ৮ আঙুলই হবে সমিধা ?

প্রথমে আমাদের সমিধা শব্দটি সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

“সমিধ্” শব্দ “সম্” উপসর্গপূর্বক দীপ্ত্যর্থক ইন্দ্ৰ ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। কাঠকে সমিধা এজন্যেই বলা হয় কেননা তা অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত ও প্রদীপ্ত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত হয়েছে আচার্য যখন ব্রহ্মচারীকে সমিধার আধান করতে বলেন তখন তার মূখ্য তাৎপর্য হলো স্বীয় অভ্যন্তরে ব্রহ্মবর্চস্ অর্থাৎ ব্রহ্মতেজকে প্রদীপ্ত করা -

সমিধমাধেহীতি সমিত্ত্বস্বাত্মনং তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেত্যেবৈনং তদাহ

শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৫।৪।৫

অথর্ববেদেও [১১।৫।৬] বলা হয়েছে ‘ব্রহ্মচার্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ’ = ব্রহ্মচারী সমিধা [ঐঃইক্ষী দীপ্তৌ-ক্লিপ্। বিদ্যাপ্রকাশেন = বিদ্যা] দ্বারা সমিদ্ধ হয়ে গুরুকুল থেকে আগত হয়। তাই সমিধা প্রদান করার সময় ব্রহ্মচারীর ন্যায় প্রত্যেক অগ্নিহোত্রীর মনোভাব এমন হবে যে এই সমিধা যেমন অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ্ত হচ্ছে তেমনি আমিও যেন পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করে প্রদীপ্ত হতে পারি।

৩ সমিধার বিষয়ে অথর্ববেদে [১১।৫।৪] বলা হয়েছে -

ইয়ং সমিৎপৃথিবী দ্যৌর্দ্বিতীয়োতান্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি।

ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাংস্তপসা পিপর্তি ॥

অর্থাৎ, পৃথিবী - সূর্য ও অন্তরীক্ষ ব্রহ্মচারীর ৩ সমিধার ন্যায়। ব্রহ্মচারী সমিধারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান, মেখলা রূপ পরিশ্রম ও এবং ব্রহ্মচার্যানুষ্ঠানরূপ তপস্যা দ্বারা লোকসমূহের পালক হয়।

পণ্ডিত ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদী এই মন্ত্রের ভাবার্থে লিখেছেন -

ব্রহ্মচারী অগ্নিহোত্রে ৩ সমিধা প্রদান করে মেখল বন্ধন ইত্যাদি আচরণের মাধ্যমে ব্রত ধারণ করে যে, সে ব্রহ্মচার্য পালনের মাধ্যমে পৃথিবী, সূর্য ও অন্তরীক্ষ বিদ্যা জেনে সংসারের উপকার করবে।

ড. তুলসীরাম শর্মা বলেছেন -

Thus the Brahmachari, with the samit inputs into the yajna, with his determination symbolised by his girdle, his hard work and austere discipline covers all the three fields of his study with a sense of fulfilment all round.

এই ৩ সমিধা মহামহিমাঙ্গাপক ত্রৈত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তার জ্ঞান গ্রহণের মাধ্যমে স্বীয় কর্তব্য পালনের দ্যোতকও বটে। যেমন -

প্রথম সমিধা - দ্বিতীয় সমিধা - তৃতীয় সমিধা

অগ্নি - বায়ু - আদিত্য

ঋগ্- যজুঃ- সাম

প্রকৃতি - জীব - ঈশ্বর

জ্ঞান - কর্ম - উপাসনা

জাগ্রত - স্বপ্ন - সুষুপ্তি

তমস্ - রজস্ - সত্ত্ব

বিট্ - ক্ষত্র - ব্রহ্ম

মাতা - পিতা - আচার্য

প্রাতঃ সবন - মাধ্যহ্নিন সবন - সায়াং সবন

দেবঋগ্ - পিতৃঋগ্ - ঋষিঋগ্

ব্রহ্মচার্য - গার্হস্থ্য - বানপ্রস্থ

অধিযজ্ঞ - অধিদৈবত - অধ্যাত্ম

বর্তমান - ভবিষ্য - ভূত

বাত - পিত্ত - কফ

সত্যম্ - শিবম্ - সুন্দরম্

শ্রবণ - মনন - নিদিধ্যাসন

মন - বচন - কর্ম

ব্যক্তি - রাষ্ট্র - বিশ্ব

শরীর - মন - আত্মা

সমিধা ৮ আঙুলই কেন?

- ১। অগ্নির সমন্ধ গায়ত্রীর ছন্দের সাথে । গায়ত্রী ছন্দে ৮ অক্ষরের ৩টি পাদ থাকে । এই গায়ত্রী ছন্দ উর্ধ্বাহরণের প্রতীক ।
 - ২। $৩ \times ৮ = ২৪$ এই ২৪ মূলতঃ ৪ ঘণ্টা নির্দেশ করে যা কিনা আমাদের তেজস্বীতা ধারণ করার প্রতীক হিসেবে নির্দেশ করা হয়।
 - ৩। দিন এবং রাত মিলিয়ে ৮ প্রহর হয় সমিধা দানের মধ্যে এই আট এবং তিন অর্থাৎ সর্বমোট ২৪ মূলতঃ দিন এবং রাত জুড়ে যেন আমরা যজ্ঞের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করি সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়েছে ।
 - ৪। আট আঙুল মূলত আটটি দিককে নির্দেশ করে ও ৩ ব্যক্তি , রাষ্ট্র এবং বিশ্বকে বোঝায় অর্থাৎ আমরা যেন ব্যক্তি, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব পর্যায়ে সব দিক থেকে নিজেকে ও সবাইকে সমৃদ্ধ করতে পারি ।
 - ৫। ৮ আঙুল যোগের অষ্ট অঙ্গ ও ৩ সমিধা শরীর - মন ও আত্মারও দ্যোতক । অগ্নিহোত্রী এই চিন্তা করে যে এই অষ্টাঙ্গ যোগ সারাজীবন কায়মনোবাক্যে পালন করবে ।
 - ৬। এছাড়াও ৮ আঙুল দেহস্থিত ধাতুরূপ অষ্ট চক্র ও ৩ সমিধা মন, আত্মা ও প্রাণের সূচক ।
 - ৭। ৮ আঙুল ৮ বসু ও ৩ সমিধা পিতা - মাতা - আচার্যকে সূচিত করে অর্থাৎ এই ৩ গুরুর মাধ্যমে আমরা যেন অষ্টবসু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি ।
 - ৮। ৮ অষ্টসিদ্ধিকেও বোঝায় ও ৩ কুমার - যুবক ও বৃদ্ধাবস্থার দ্যোতক। অর্থাৎ যান্ত্রিক এই ভাবনা গ্রহণ করে যে অষ্ট সিদ্ধি লাভ করে এই দেহের ৩ অবস্থায় সকলের কল্যাণ করবো।
- অতঃ প্রতিটি দেবযজ্ঞের সময় আমাদের এই ত্রয়ী তত্ত্বে অভ্যাসপূর্বক কর্ম সম্পাদন করা আবশ্যিক।



মধুসূদন গুপ্ত প্রথম জাতীয় স্নাতক শব্দ ব্যবচ্ছেদকারী

সেদিন ১৮৩৬ সালের ২৮ শে অক্টোবর, আগের বছর প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মেডিকেল কলেজে সেদিন সাজ সাজ রব। কেন? কী ছিল সেদিন? সেদিন প্রায় ২৫০০ বছর বিরতির পর ভারতের বুকে আবার একটি ভারতীয় মানুষ, একজন হিন্দু ধর্মালম্বী এই প্রথমবারের মতো শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করবেন এই মর্মে চলছিল টানটান উত্তেজনা। সেই কাহিনীতে আসছি একটু পর।

আপনারা জানেন সার্জারির চিকিৎসায় শব বা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ (Dissection) এক অত্যাবশ্যিকীয় অঙ্গ। অথচ যে ভারতবর্ষের ঋষি সুশ্রুত আজ থেকে ২৭০০ বছর আগে বিশ্বে সার্জারি বিদ্যার জনকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, করেছিলেন অসংখ্য ব্যবচ্ছেদ ও অপারেশন, সেই ঋষি সুশ্রুতের দেশে ২৫০০ বছর ধরে সার্জারি করা বন্ধ ছিল। কেন?

ঋষি সুশ্রুত পৃথিবীতে Rhinoplasty বা বিকৃত নাকের আকার আকৃতি ঠিক করার অপারেশন (যার নাম সুশ্রুত দিয়েছিলেন নাসিকাসন্ধান), Otoplasty বা বিকৃত কানের লতিকে সঠিক আকৃতি প্রদানের অপারেশন এবং Facial Surgery (বিকৃত মুখের আকৃতি ঠিক করা), চোখের ক্যাটারাক্ট সার্জারি এর আবিষ্কারক ছিলেন। তিনি অঙ্গহানীর অপারেশন, হেমরয়েডস, পাইলস, ল্যাবিওপ্লাস্টি, ল্যারিংগোপ্লাস্টি সহ বিভিন্ন জটিল অপারেশনের কথা সেই সময়ে বলে গিয়েছিলেন। কেবল মুখের থেকে চামড়া কেটে নিয়ে কানের লতি মেরামতের প্লাস্টিক সার্জারির ই ১৫ রকম পদ্ধতি তিনি বর্ণনা করেন যে অপারেশনের নাম তিনি দেন কর্ণবন্ধ।

আজ থেকে ২৭০০ বছর আগে তিনি লেখেন সুশ্রুত সংহিতা নামের জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ যে গ্রন্থ ৮ম শতকে আরব দেশে বাগদাদের খলিফা মনসুরের নির্দেশে কিতাব-ই-সুশ্রুত নামে অনুবাদিত হয়েছিল আর সেই গ্রন্থের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন বিখ্যাত এরাবিক পলিম্যাথ ইবনে সিনা। ঋষি সুশ্রুতের এই গ্রন্থের মাধ্যমেই আরবের স্বর্ণযুগে সার্জারি বিদ্যা ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় একই সময়ে কনস্টান্টিনোপল এই বইটি অনুবাদিত হলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই বইটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

এছাড়াও তুরস্কের ভাষায় বাওয়ার লিপিতে অনুবাদিত সুশ্রুত সংহিতার একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি তুরস্কের কুহার অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় যা ছিল ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের!

তবে সবচেয়ে বড় বিপ্লবটি সংগঠিত হয় ইউরোপে। নবম শতকে ঋষি সুশ্রুতের এই বইটি ইতালীতে অনুবাদিত হয়ে প্রবেশ করলে এক নতুন যুগের উন্মোচন হয়।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ Erwin Heinz Ackerknecht বলেন,

“এতে কোন সন্দেহই নেই ইউরোপের আজকের প্লাস্টিক সার্জারির অগ্রগতি যা মধ্যযুগে ইতালীতে

বহমান হয়েছিল তা ক্লাসিকাল ইন্ডিয়ান সার্জারির সরাসরি উত্তরাধিকারি।”

যে ঋষি সুস্কৃত আজ থেকে ২৭০০ বছর আগে তাঁর বইতে ১২০ ধরনের সার্জিকাল যন্ত্রপাতি ও ৩০০ ধরনের অপারেশনের কথা লিখে বিশ্বের কাছে প্লাস্টিক সার্জারির জনক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন,যাঁর আবক্ষ ভাস্কর্য সন্মানের সহিত মেলবোর্ন রয়াল কলেজ অব সার্জারির সামনে শোভা পায় তাঁর দেশই কেন এত বছর ধরে সার্জারি চিকিৎসা নিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল?

কারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের তথাকথিত গোঁড়া,অশিক্ষিত হিন্দু নেতাদের ধারণা ছিল শব ব্যবচ্ছেদ করা অচ্ছুত, অপবিত্র কাজ। বর্ণহিন্দুরা কখনো লাশ কাটাকাটি করতে পারেনা,এটা নাকি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ!লাশ কাটাকাটি করলে পাপ হয়,অশৌচ হয়! কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বললেই তথাকথিত হিন্দু নেতা,সমাজপতিরা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত।সেই নেতারা ই যারা বিদ্যাসাগরকে,রামমোহনকে,দয়ানন্দকে অসংখ্যবার হত্যার হুমকি দিয়েছিল তথাকথিত মনগড়া সনাতন পরম্পরা ভাঙ্গার জন্য।আজকের দিনেও কিন্তু আমরা সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন নেতাদের দেখতে পাই পদে পদে।

কিন্তু ১৮৩৬ সালের ২৮ শে অক্টোবর এক উদ্যোগী হিন্দু চিকিৎসক, আয়ুর্বেদ সংস্কৃত কলেজে পড়ে আসা ও তৎকালীন সময়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. মধুসূদন গুপ্ত এই ২৫০০ বছরের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার প্রতিজ্ঞা নেন।সেদিন কলকাতায় টানটান উত্তেজনা।কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু নেতারা প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তপ্ত।সম্পূর্ণ কলকাতা মেডিকেল কলেজকে ঢেকে দেয়া হলো নিরাপত্তার চাদরে আক্রমণের ভয়ে।একইসাথে আনন্দের উত্তেজনা ও ভয়মিশ্রিত পরিবেশ।তারপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ড. হেনরি হ্যারি গুডিং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ডা মধুসূদন গুপ্ত ও তাঁর চার ছাত্র রাজকৃষ্ণ দে, উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্র করেন ২৫০০ বছর পর প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক হিসেবে প্রথম কোন শব ব্যবচ্ছেদ। তাঁর এই কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি করা হলো। আর তাঁর এই কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে তৎকালীন হিন্দু সমাজপতিরা কী করেছিল জানেন? তারা ডা. মধুসূদন গুপ্তকে জাতিচ্যুত ঘোষণা করেছিলেন!

অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? মধুসূদন গুপ্ত কিন্তু বর্তমান সময়ের ডাক্তারদের মতো কোন মেডিকেল কলোজে পড়েন নি,পড়েছিলেন আয়ুর্বেদ সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক বিভাগে। ১৮৩৫ সালে যখন বৈদ্যক বিভাগ বন্ধ হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাঁকে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিলে অনেকেই আপত্তি করেন।তারা বলেন যেহেতু মধুসূদন গুপ্ত ডাক্তারী পাশ করেন নি,আয়ুর্বেদ কলেজ থেকে পড়েছেন তার কাছে আমরা কেন পড়ব? তখন ছাত্রদের অসন্তোষ প্রশমনের জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষ পাশ করা ডাক্তারের ডিগ্রি নেবার জন্য তাঁকে ডাক্তারী পেশার চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষা দিতে বলেন। তিনি রাজি হয়ে যান ও ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কবিরাজ থেকে ডাক্তারে পরিণত হন।

মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর ডাক্তারীর চূড়ান্ত পরীক্ষার উত্তরপত্রটির ব্যাপারে এই মর্মে একটি সংশাপত্র দেন যে, “বৈদ্যবাটীর মধুসূদন গুপ্তর উত্তরপত্রটি যত্ন করে পরীক্ষা করে বুঝেছি যে শারীরসংস্থান,শারীরবৃত্ত, রসায়ন ,মেটিরিয়া মেডিকা ইত্যাদিতে তাঁর অসামান্য জ্ঞান আর ঔষধ, শল্যচিকিৎসা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষমতা বিষয়ে তাঁর দক্ষতা সংশয়াতীত।”

আর এই গুণী ডা. মধুসূদন গুপ্তকেই আমাদের স্বার্থবাদী,প্রচণ্ড কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজপতিরা

জাতিচ্যুত করে দিয়েছিলেন সার্জারি করার অপরাধে। অথচ আপনারা কী জানেন পৃথিবীর কোন গ্রন্থটি সর্বপ্রথম সার্জারির কথা উল্লেখ করেছে? হ্যাঁ অনেকে ঠিক ই ধরেছেন সেই গ্রন্থের নাম হলো ঈশ্বরের অলংঘনীয়, অমোঘ বাণী পবিত্র বেদ।

পবিত্র অথর্ববেদ ৪.১২.৫ বলছে-

অসৃক্তে অস্থি রোহতু ছিন্নম্ সং ধেহোষধে।

অর্থাৎ ছিন্ন হয়ে যাওয়া অস্থি একে অপরের সাথে সংযুক্ত করো।

পবিত্র অথর্ববেদ ১.১৭.১ বলছে শিরা-ধমনী ছিড়ে রক্তপাতের সময় রক্তপাত বন্ধ করার শল্যপদ্ধতির কথা-

অমুর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।

ওই রক্তবাহক শিরা-ধমনীগুলো যা থেকে রক্তপাত হয়ে তারা তাদের শক্তিমত্তা হারিয়ে ফেলেছে তাদের রক্তপাত বন্ধ করো।

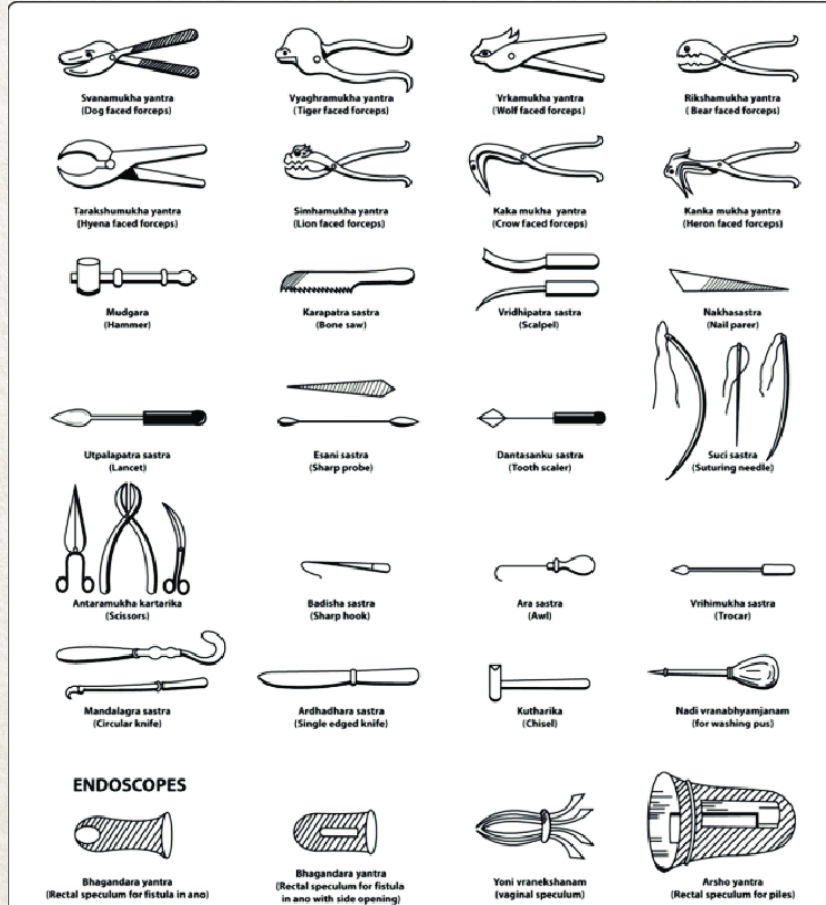
২ নং মন্ত্রটিও শল্য পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে বলছে-

তিষ্ঠাবরে তিষ্ঠা ওর উত ত্বং তিষ্ঠ মধ্যমে।

কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতি তিষ্ঠাদিদ্ধমনীমহি।।

অর্থাৎ উপরের ধমনীটির রক্তপাত বন্ধ করো, নিচের দিকের ধমনীটির রক্তপাত বন্ধ করো, মাঝখানে থাকা ধমনীটিরও রক্তপাত বন্ধ করো। ছোট ধমনীটির রক্তপাত বন্ধ হয়েছে, বড় ধমনীটির রক্তপাতও বন্ধ করতে হবে।

তাহলে ভেবে দেখুন যে জাতির প্রধান ধর্মগ্রন্থেই বলা ছিল শল্যচিকিৎসার কথা, যে জাতির প্রধান ধর্মগ্রন্থে চিকিৎসকদের বলা হয় বৈদিক ভাষায় ভিষগ এবং তাদের অত্যন্ত সম্মানিত করা হয়েছে অনেকগুলো বেদমন্ত্রে, যে জাতির একজন বিখ্যাত ঋষি সমগ্র পৃথিবীতে প্লাস্টিক সার্জারীর জনক বলে খ্যাত সেই জাতির মূর্খ সমাজপতিরা কুসংস্কারের, পরম্পরার, মনগড়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ভারতীয়দের সার্জারি করার পথ আঁটকে রেখেছিল ২.৫ হাজার বছর! যারা এ অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছিলেন তাঁদের উপরে এসেছিল অসংখ্য আক্রমণ, সামাজিক অত্যাচার, অমর্যাদা কিন্তু রাতশেষে সূর্যের উদয় হবেই, আলোর প্রকাশ কেউ আঁটকাতে পারবেনা কোনদিন। রাবণরা কখনো রামচন্দ্রকে আঁটকাতে পারেনি, সত্যের জয় যে অবশ্যস্তাবী!



(১ম ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন মধুসূদন গুপ্তকে। দ্বিতীয় ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজ হতে ২৭০০ বছর আগে ঋষি সুশ্রুতের ব্যবহার করা সার্জিকাল যন্ত্রপাতির কিছু চিত্রাংকন যা তাঁর দিয়ে যাওয়া বর্ণনা অনুসারে আঁকা হয়েছে আধুনিককালে এবং সেইসব যন্ত্রপাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে আধুনিক সার্জারি বিদ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির)



মহর্ষি দয়ানন্দ স্বামী ও আৰ্যসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা বলেছেন

[১]

যখন কোনো প্রবল সংঘর্ষে, কোনো নূতন শিক্ষায় একটা জাতি জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন সে নিজেরই মধ্যে শক্তি সন্ধান করে। সে জানে যে, ধার করিয়া চলে না। যদি পৈতৃক ভাণ্ডারে মূলধন থাকে তবেই বৃহৎ বানিজ্য এবং লক্ষীলাভ, নতুবা চিরদিন উজ্জ্বলতা।

আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদেরকে এমন জটিল বিচিত্র ও সুদৃঢ় ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে, যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই চিরোদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা ধুমকেতুর মতো দুই-চারিজন মাত্র গর্ববিস্তারিতপুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকিয়া যাইতে পারি, কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে তেমন লঘুত্ব সম্ভবপর নহে।

অতএব এক দিকে আমাদের দেশীয়তা, অপর দিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি, উভয়ই আমাদের পরিব্রাজকের পক্ষে অত্যাৱশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।

মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত আৰ্যসমাজ ক্ষুদ্র হিন্দুয়ানিকে আৰ্য-উদারতার দিকে প্রসারিত করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তাহা যে রূপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে তাহাতে আমরা মহৎ-আশার কারণ দেখিতেছি।

উক্ত সমাজের, অন্তত সমাজস্থাপয়িতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রচারিত মতের প্রধান গুণ এই যে, তাহা দেশীয়তাকেও লঙ্ঘন করে নাই, অথচ মনুষ্যত্বকেও খর্ব করে নাই। তাহা ভাবে ভারতবর্ষীয়, অথচ মতে সার্বভৌমিক। তাহা হৃদয়ের বন্ধনে আপনাকে প্রাচীন স্বজাতির সহিত বাঁধিয়াছে, অথচ উন্মুক্ত যুক্তি এবং সত্যের দ্বারা সর্বকালের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

এই সমাজের সমস্ত লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা আশা করিতেছি যে, ইহা ভারতে আর-একটি অভিনব সম্প্রদায় রূপে নূতন বিচ্ছেদ আনয়ন না করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রমশ এক করিতে পারিবে। বারান্তরে আৰ্যসমাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রবীন্দ্র-রচনাসমগ্র-প্রবন্ধ-সমূহ-পরিশিষ্ট-

কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান-প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে-রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক-একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপমাত্র নহে-ইহারা পরস্পর গ্রথিত, ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে নাই-ইহারা সকলেই রহিয়াছে, ইহারা সন্ধিতেই হউক, সংগ্রামেই হউক, ঘাতপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে।

রবীন্দ্র-রচনাসমগ্র-প্রবন্ধ-রাজা প্রজা-পথ ও পাথেয়





স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সম্পর্কে ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধাঙ্গাপন

আমাদের দেশে যাঁরা সত্যের ব্রত গ্রহণ করবার অধিকারী, এবং সেই ব্রতকে প্রাণ দিয়ে যাঁরা পালন করবার শক্তি রাখেন, তাঁদের সংখ্যা অল্প বলেই দেশের এত দুর্গতি। এমন চিন্তাদৈন্যে যেখানে সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো অতবড়ো বীরের এমন মৃত্যু যে কতদূর শোকাবহ তার বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে একটি কথা এই আছে যে, তাঁর মৃত্যু যতই শোচনীয় হোক, সে-মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ তাঁর চরিত্র ততই মহীয়ান হয়েছে। বারে বারে ইতিহাসে দেখা যায়, নিজের সমস্ত দিয়ে যাঁরা কল্যাণব্রতকে গ্রহণ করেছেন অপমান ও অপমৃত্যু তাঁদের ললাটে জয়তিলক এমনি করেই এঁকেছে। মহাপুরুষরা আসেন প্রাণকে মৃত্যুর উপরেও জয়ী করতে, সত্যকে জীবনের সামগ্রী করে তুলতে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে প্রাণ দেবার যা উপকরণ রয়েছে তা বায়ুতে আছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেও আছে। কিন্তু, যতক্ষণ তা উদ্ভিদে প্রাণীতে জৈব আকার না ধারণ করে ততক্ষণ প্রাণের পুষ্টি হয় না। সত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। শুধুমাত্র বাক্যের হাওয়া থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে তাকে জীবনগত করবার শক্তি ক'জনাই বা আছে। সত্যকে জানে অনেক লোকে, তাকে মানে সেই মানুষ যে বিশেষ শক্তিমান। প্রাণ দিয়ে তাকে মানার দ্বারাই সত্যকে আমরা সকল মানুষের করে দিই। এই মানতে পারার শক্তিটাই মস্ত জিনিস। এই শক্তির সম্পদ যাঁরা সমাজকে দেন তাঁদের দান মহামূল্য। সত্যের প্রতি সেই নিষ্ঠার আদর্শ শ্রদ্ধানন্দ এই দুর্বল দেশকে দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনা-পরিচয়ের উপযোগী যে-নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই নাম তাঁর সার্থক। সত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা তাঁর সাধনাকে রূপমূর্তি দিয়ে তাকে তিনি সজীব করে গেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুও আলোকের মতো হয়ে উঠে তাঁর শ্রদ্ধার সেই ভয়হীন ক্ষয়হীন ক্লাস্তিহীন অমৃতচ্ছবিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার এই ভূমানন্দকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে আজ আমরা যেন সার্থক আকারে দেখতে পারি। এই সার্থকতা বাহ্য ফলে নয়, নিজেরই অকৃত্রিম বাস্তবতায়।

অপঘাতের এই-যে আঘাত শুধু মহাপুরুষেরাই একে সহ্য করতে পারেন, শুধু তাঁদের পক্ষেই এর কোনো অর্থ নেই। যাঁরা মরণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে তুলতে পেরেছেন জীবন থাকতেই তাঁরা অমৃতলোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু, মৃত্যুর গুপ্তচর তো শ্রদ্ধানন্দের আয়ু হরণ করেই ফিরে যাবে না। ধর্মবিদ্রোহী ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্তকলুষিত যে বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে সে বিস্তার করেছিল অনতিকাল পূর্বেই, সে তো আমরা দেখেছি। সে যাদের নষ্ট করেছে তাদের তো কিছুই অবশেষ থাকে নি। তাদের মৃত্যু যে নিরতিশয় মৃত্যু, তাদের ক্ষতি যে চরম ক্ষতি।

তাদের ঘরে সন্তানহীন মাতার ক্রন্দনে সান্ত্বনা নেই, বিধবার দুঃখে শান্তি নেই। এই-যে নিষ্ঠুরতা যা

সমস্তুকে নিঃশেষে চিতাভস্মে সমাধা করে, তাকে তো সহ্য করতে পারা যায় না। দুর্বল স্বল্পপ্রাণ যারা, যাদের জনসাধারণ বলি, তারা এতবড়ো হিংসার বোঝা বইবে কী করে। এখন দেখতে পাচ্ছি, আবার যমরাজের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হল, আবার প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে হত্যার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এর দুঃখ সহিবে কে।

বিধাতা যখন দুঃখকে আমাদের কাছে পাঠান তখন সে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা আমাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। বিপদ আসবে না এমন হতে পারে না-সংকটের সময় উপস্থিত হয়, আশু উদ্ধারের উপায় থাকে না, কিন্তু কী ভাবে বিপদকে আমরা ব্যবহার করি তারই উপরে প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভর করে। এই-যে পাপ কালো হয়ে দেখা দিল, এর ভয়ে ভীত হব না এর কাছে মাথা নত করব? না সে পাপের বিরুদ্ধে পাপকে দাঁড় করাব? মৃত্যুর আঘাত, দুঃখের আঘাতের উপর রিপূর উন্মত্ততাকে জাগ্রত করব? শিশুর আচরণে দেখা যায়, সে যখন আছাড় খায় তখন মেজেকে আঘাত করতে থাকে। যতই আঘাত করে মেজে ততই সে আঘাত ফিরিয়ে দেয়। এ শিশুর ধর্ম। কিন্তু, যদি কোনো বয়স্ক লোক হোঁচট খায় তবে সে চিন্তা করে, বাধাটা কোথায়-বাধা যদি থাকে তো সেটা লঙ্ঘন বা সেটাকে অপসারণ করতে হবে। সচরাচর দেখতে পাই বাহির থেকে আকস্মিক আঘাতের চমকে মানুষের শিশুবুদ্ধি ফিরে আসে। সে তখন মনে করে, ধৈর্য অবলম্বন করাই কাপুরুষতা, ক্রোধের প্রকাশ পৌরুষ। আজকের দিনে স্বভাবতই ক্রোধের উদয় হয়ে থাকবে, সে কথা স্বীকার করি। মানবধর্ম তো একেবারে ছাড়তে পারি নে। কিন্তু ক্রোধ দ্বারা যদি অভিভূত হই তবে সেও মানবধর্ম নয়। আগুন লেগে পাড়া যদি নিরুপায়ে ভস্ম হয়ে যায় তবে আগুনের রুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তখন যদি দোষ কাউকে দিতে হয় তো আগুনকে যেন না দিই। বিপদের কারণ সর্বত্রই থাকে, তার প্রতিকারের উপায় যারা রাখে না তারাই দোষী। যাদের ঘর পুড়েছে তারা যদি বলতে পারে যে, কুপ খনন করে রাখি নি সেই অপরাধের শাস্তি পেলেম, তা হলে ভবিষ্যতে তাদের ঘর পোড়ার আশঙ্কা কমে। আমাদেরও আজকে তাই বলতে হবে। অপরাধের গোড়ার কথাটা ভাবা চাই। শুনে হয়তো লোকে বলবে, না, এ তো ভালো লাগছে না, একটা প্রলয়-ব্যাপার বাধিয়ে দিতে পারলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই, অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত। বিদেশীর রাজ্যে রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের একটা বাহ্য যোগ থাকে, অথচ আন্তরিক সম্বন্ধ থাকে না। বিদেশীয় রাজত্বে এইটেই আমাদের সবচেয়ে পীড়া দেয়। গায়ে-পড়া যোগটা দুর্বলতা ও অপমান আনে। বিদেশী শাসন সম্পর্কে যদি এ কথা খাটে তবে স্বদেশীয়দের সম্বন্ধে সে আরও কত সত্য। এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদয়তার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে-সেইখানেই যে ছিদ্র-ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। আমাদের দেশে কল্যাণের রথযাত্রায় যখনই সকলে মিলে টানতে চেষ্টা করা হয়েছে-কংগ্রেস প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টা দ্বারা, সে-রথ কোথায় এসে থেমে যায়, ভেঙে পড়ে?

যেখানে গর্তগুলো হাঁ ক'রে আছে হাজার বছর ধরে।

আমাদের দেশে যখন স্বদেশী-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয় নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয় নি। কিন্তু, কেন দেয় নি। তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য! কিন্তু, এতবড়ো আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানসমাজকে স্পর্শ করল না! সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয় নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি। সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না। এমন কথা উঠতে পারে যে, ডোবা তো সনাতন ডোবা, কিন্তু আজ তার মধ্যে যে দুর্শ্চিকিৎস্য বিভ্রাট ঘটছে সেটা তো নূতন, অতএব হাল আমলের কোনো একটা ভূত আমাদের ঘাড় ভাঙবার গোপন ফন্দি করেছে, ডোবার কোনো দোষ নেই, ওটা ব্রহ্মার বুড়ো আঙুলের চাপে তৈরি। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ভাঙা গাড়িকে যখন গাড়িখানায় রাখা যায় তখন কোনো উপদ্রব হয় না। সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা করতে পারে, চাই কি মধ্যাহ্নের বিশ্রামাবাসও হতে পারে। কিন্তু, যখনই তাকে টানতে যাই তখন তার জোড়ভাঙা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয়। যখন চলি নি, রাষ্ট্রসাধনার পথে পাশাপাশি রয়েছি, গ্রামের কর্তব্য পালন করেছি, তখন তো নাড়া খাই নি। আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম, এ কেন, তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তার পর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টক্টকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বহুতামপেয়র উপর দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।

আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উদ্‌বোধন হয়েছে বলেই যত ভেদ, যত ফাঁক, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই মার খাচ্ছি। এই মার নানা রূপে আসে-কিন্তু, আজ বড়ো করে দেখা দিল এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে। মহাপুরুষেরা এই মারকে বক্ষে গ্রহণ করে এর একান্ত বীভৎসতার পরিচয় দেন। তাতেই আমাদের চৈতন্য হয়। এই যে চৈতন্য এসেছে, রিপূর বশবর্তী হয়ে কি এই শুভ অবসরকে নষ্ট করব না শুভবুদ্ধিদাতাকে বলব, যেখানেই ভেদ ঘটিয়েছি সেখানেই পাপের বেদি গেঁথেছি, তার থেকেই বাঁচাও! এই-যে রুদ্ধবেশে পাপ দেখা দিল এ তো ভালোই হয়েছে এক ভাবে। আজকে না ভেবে উপায় নেই যে, কী করে একে চিরকালের মতো পরাভূত করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আশু আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করব। সহসা এ-প্রশ্নের একটা পাকারকম উত্তর দিই এমন শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা-আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে সে উপায় একদিন পাবই। আজকে সেই পরীক্ষা-আরম্ভের আয়োজন। আজকে দেখতে

হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন্ ছিদ্র, কোন্ পাপ আছে, অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দুসমাজকে আহ্বান করতে হবে; বলতে হবে, পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি, বাইরের আঘাতের জন্য নয়, আমাদের ভিতরের পাপের জন্য। এসো আজ সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি। আমাদের পক্ষে এ বড়ো সহজ কথা নয়। কেননা, অন্তরের মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত ভেদবুদ্ধি, বাইরেও বহুদিনের গড়া অতি কঠিন ভেদের প্রাচীর। মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায় নি-এক ঈশ্বরের নামে “আল্লাহো আক্ববর” বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব “হিন্দু এসো” তখন কে আসবে। আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডী, কত প্রাদেশিকতা-এ উত্তীর্ণ হয়ে কে আসবে। কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হই নি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলাম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। কখনও কখনও ইতিহাস উদ্ঘাটন করে অন্য প্রমাণ পাবার চেষ্টা করি বটে; বলি, শিখরা তো একসময় বাধা ঘুচিয়েছিল। শিখরা যে বাধা ঘুচিয়েছিল সে তো শিখধর্ম দ্বারাই। পাঞ্জাবের কোথাকার জাঠ, কোথাকার কোন্ জাতি সব, শিখধর্মের আহ্বানে একত্র হতে পেরেছিল; বাধাও দিতে পেরেছিল; ধর্মকেও রক্ষা করতে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিবাজি একসময় ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভিত গোড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তদ্বারা তিনি মারাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে উপদ্রুত করে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয় কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না; শিবাজির হয়ে সেদিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজির তেমনি সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে সামঞ্জস্য রইল না, পেশোয়াদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ক্ষণকালীন রাষ্ট্রবন্ধনকে টুকরো টুকরো করে দিলে। আমার কথা এই যে, আমাদের মধ্যে এই-যে পাপ পুষে রেখেছি এতে কি শুধু আমাদেরই অকল্যাণ, সে পাপে কি আমরা প্রতিবেশীদের প্রতি অবিচার করি নে, তাদের মধ্যে হিংসা জাগিয়ে তুলি নে? যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ করে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই- তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ভ্রূর হোয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না-কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে-কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ্য নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে-মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে, সে-মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ তো কোনো ফল হবে না।

আপনার লোককেও যে পর করেছে, পরের সঙ্গেও যার আত্মীয়তা নেই, সে তো ঘাটে এসেছে, তার ঘর কোথায়। আর তার শ্বাসই বা কতক্ষণ। আজ আমাদের অনুতাপের দিন-আজ অপরাধের ক্ষালন

করতে হবে। সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত যদি করি তবেই শত্রু আমাদের মিত্র হবে, রুদ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।

মাঘ, ১৩৩৩

মূল উৎসঃ রবীন্দ্র রচনাবলী-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবন্ধ (রবীন্দ্র)-কালান্তর -স্বামী শ্রদ্ধানন্দ



স্বাধ্যায় প্রকাশনী

বাংলাদেশ অগ্নিবীরের নিজস্ব প্রকাশনী

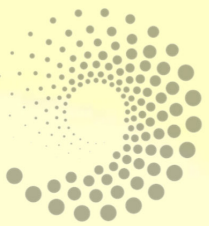
**সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন
নিম্নোক্ত নম্বরে:-**

শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ (ঢাকা)
01786659164 (হোয়াটসঅ্যাপ)

শ্রী লনী দাশ (সিলেট)
01745150032 (বিকাশ)
01628739888 (নগদ)

শ্রী জনি আর্ষ (চট্টগ্রাম)
01822310609 (নগদ, বিকাশ, রকেট)

শ্রী অরূপ দাশ (চট্টগ্রাম)
01313090582
(নগদ, বিকাশ, রকেট)



যজুর্বেদ

এক সরল পরিচয়

ডা. ভবানীলাল ভারতীয়
অনুবাদকঃ সতীশ চন্দ্র মন্ডল, বিদ্যারত্ন



**যজুর্বেদ এক সরল
পরিচয়-১৬০টাকা**

ওঁঃম্
**যোগেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণ**



পণ্ডিত চম্পতি এম. এ.

অনুবাদকঃ
সতীশ চন্দ্র মন্ডল, বিদ্যারত্ন

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-৩৫০টাকা

ঋগ্বেদ

এক সরল পরিচয়

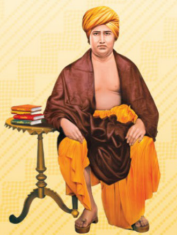
ডা. ভবানীলাল ভারতীয়
অনুবাদকঃ সতীশ চন্দ্র মন্ডল, বিদ্যারত্ন



**ঋগ্বেদ এক সরল পরিচয়-
১৭০টাকা**

**ভারত-ভাগ্য বিধাতা
দয়ানন্দ**

লেখকঃ স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী
অনুবাদকঃ সতীশ চন্দ্র মন্ডল, বিদ্যারত্ন



**ভারত ভাগ্য বিধাতা,
দয়ানন্দ-১০০টাকা**



মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর বঙ্গে দিনগুলো যেমন ছিলো

মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন (১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭২) হইতে কয়েক মাস পর্যন্ত হেমচন্দ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। হেমচন্দ্র দয়ানন্দের নিকট উপনিষদ পাঠ ও যোগবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ‘দয়ানন্দ-প্রসঙ্গ’ এই নামে হেমচন্দ্র কয়েক মাসের দিনপঞ্জী লিখিয়াছিলেন। দয়ানন্দ বঙ্গ দেশে চারি মাস কাল ছিলেন। এই হস্তলিখিত সংক্ষিপ্ত দিন-পঞ্জীতে উক্ত চারি মাসের সূক্ষ্ম ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি। সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন জীর্ণ খাতাপত্রের মধ্যে ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন জীর্ণ খাতাপত্রের মধ্য হইতে এই হস্তলিখিত দিনপঞ্জী হঠাৎ স্বর্গীয় আচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে আসে। তিনি আমাকে এই দিনপঞ্জী খানি দেখাইয়াছিলেন। আমি তখন আপার চিৎপুর রোডস্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় উপনিষদ ও বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা করিতাম। সে আজ ২২/২৩ বৎসর পূর্বের কথা। আমি হেমচন্দ্র লিখিত দিনপঞ্জী খানি সম্পূর্ণ নকল করিয়া ছিলাম। দিন-পঞ্জীতে উল্লিখিত বহু ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাদটীকায় সন্নিবেশ করিলাম। পাদটীকা আমার নিজস্ব।

মন্দির, তাঃ ১।১।৫৪ কলিকাতা আর্ঘ্য সমাজ
পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী

সম্পূর্ণ দিনপঞ্জী

১৬ ডিসেম্বর, ১৮৭২। কাশী শাস্ত্র-বিচারের বিজেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনে সন্ন্যাসীকে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বরাহনগর “নাইনান” বাগান বাড়ীতে তাহার আহার ও বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল।

[পাদটীকা- ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা, “ভূ-প্রদক্ষিণ” প্রণেতা। কাশী শাস্ত্রবিচারে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির বেদজ্ঞ পণ্ডিত, বহু বৈদিক সাহিত্যের প্রকাশক। তিনিও কাশী শাস্ত্রবিচারে উপস্থিত ছিলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি (বোম্বাই, ১৮৮৫) ছিলেন।]

১৭-২০ ডিসেম্বর, ১৮৭২। দয়ানন্দ সন্ন্যাসীর দর্শনের জন্য “নাইনানে” অসম্ভব লোকসমাগম। তাহার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইলাম না।

২১ ডিসেম্বর ১৮৭২। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। কেশবচন্দ্র সেনকেও দেখিলাম।

২২ ডিসেম্বর ১৮৭২। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ত্রিদিব ভট্টাচার্যের সঙ্গে সন্ন্যাসীর দর্শন করিলাম। যজ্ঞোপবীত, বর্ণভেদ, যজ্ঞ, আত্মা ও ষড়্দর্শন সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। আত্মা তৃপ্ত হইল।

[পাদটীকা-দ্বিজেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং হেমেন্দ্রনাথ তাহার তৃতীয় পুত্র।]

২৩-২৮ ডিসেম্বর ১৮৭২। ব্রাহ্মসমাজের কার্যে ব্যস্ত থাকায় সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে পারিলাম না।

২৯শে ডিসেম্বর ১৮৭২। সন্ন্যাসীর নিকট নূতন ভাবে উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনিলাম। কেশবসেনের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

৩০-৩১ ডিসেম্বর ১৮৭২। নাইনানে যাইতে পারিলাম না। শুনিলাম অক্ষয় কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু এই দুই দিনে বেদ ও হোম সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন।

[পাদটীকা-অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৬৮ খৃঃ) ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রের সম্পাদক ও বিভিন্ন গ্রন্থলেখক। “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ। কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের ইনি পিতামহ। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬ ১৮৯৯ খৃঃ) ঋষি অরবিন্দের মাতামহ বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থের লেখক, উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদক; ধর্ম সমাজ, ভাষা ও রাজনীতি বিষয়ে বহু বাংলাগ্রন্থের রচয়িতা, ব্রাহ্মসমাজের নেতা।]

১লা জানুয়ারী ১৮৭৩। কেশবচন্দ্র সেন দয়ানন্দ সরস্বতীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিলেন।

[পাদটীকা- কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৮ খৃঃ) নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার চেষ্ঠায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন অসবর্ণ বিবাহ আইন পাশ হয়। ভারতে ও ইউরোপে তিনি অসাধারণ বাগ্মীরূপে পরিচিত ছিলেন।]

২রা জানুয়ারী ১৮৭৩। সন্ন্যাসীর নিকট উপনিষদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। কৃষ্ণদাস পাল নাইনে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্তা করিলেন। বেদবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে কৃষ্ণদাস পাল হর্ষ জ্ঞাপন করিলেন।

[পাদটীকা-কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪ খৃঃ) হিন্দু পেট্রিয়ট নামক ইংরেজী পত্রের সম্পাদক, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ও বড়লাটের মন্ত্রী সভার সভ্য।]

৩ জানুয়ারী ১৮৭৩। সন্ন্যাসীর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বাদুড়বাগানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গৃহে আগমণ। বিধবা-বিবাহ, নিয়োগ, বাল্য বিবাহ, কৌলীণ্য প্রথা, বৃদ্ধ-বিবাহ, শিশু-বিবাহ সম্বন্ধে উভয়ের

মধ্যে আলাপ। বিদ্যাসাগর অসুস্থ ছিলেন। সন্ন্যাসীর বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আনন্দ।

৪ জানুয়ারী ১৮৭৩। রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের গৃহে কেশবচন্দ্র কর্তৃক বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরামর্শ সভার আয়োজন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উত্তর পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঠিক হইল সংস্কৃত কলেজে বেদপাঠের ব্যবস্থা সম্ভবনা হইলে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে।

[পাদটীকা-যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮ খৃঃ) পাথুরিয়াঘাটার জমিদার, স্যার-সি-এস-আই-মহারাজা উপাধিতে ভূষিত, বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সহকারী সভাপতি। মহারাজা প্রদ্যোতকুমার তাহারই পুত্র। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮ খৃঃ) উত্তরপাড়ার জমিদার। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ইহারই পুত্র। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ খৃঃ) সি-আই-ই, এডুকেশন গেজেটের পরিচালক, বহু গ্রন্থলেখক, স্কুল ইন্সপেক্টর, শিক্ষা দর্পণ পত্রিকার সংস্থাপক, ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য]-

৫-৭ জানুয়ারী ১৮৭৩। সন্ন্যাসী আমাকে যম নিয়মের উপদেশ দিলেন ও লঘু প্রাণায়ামের প্রণালী শিক্ষা দিলেন। কেশবচন্দ্র ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিলেন। আর্য জাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে আলোচনা।

[পাদটীকা-রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ই-সি-আই-ই (১৮২৪-১৮৯১ খৃঃ) বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ, ঐতিহাসিক, “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক, এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, প্রত্নতত্ত্ববিদ, হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক, ইণ্ডো,এরিয়ান্স আদিবহু ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা)]।

৮ জানুয়ারী ১৮৭৩ সন্ন্যাসীর নিকট যোগ বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ লাভ। রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামতনু লাহিড়ীতাহার সঙ্গে নাইনানে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা। সন্ন্যাসী তাকে বঙ্গদেশে বেদ প্রচারের অনুরোধ জানাইলেন। “এই শরীরে আর হইবেনা, পরজন্মে দেখা যাইবে”-ঈশ্বরচন্দ্র এই উত্তর করিলেন। রামতনু লাহিড়ী প্রাচ্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

[পাদটীকা রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮ খৃঃ) ডেভিড হেয়ারের শিষ্য ও ডিরোজিওর ভক্ত, শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক ও বিদ্যাসাগরের বন্ধু।]

৯ জানুয়ারী ১৮৭৩। কেশবচন্দ্র সেনের লিলি কটেজে সন্ন্যাসী দয়ানন্দের সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। রাজনারায়ণ বসু সন্ন্যাসীকে ‘হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ নামক গ্রন্থ উপহার দিলেন ও তাহা হইতে কোন কোন অংশ হিন্দী করিয়া শুনাইলেন। লিলি কলেজে আসিবার পূর্বে তিনি এসিয়াটিক মিউজিয়াম পরিদর্শন করিলেন ও বেদ-উপনিষদ্ কয়েক খণ্ড ক্রয় করিলেন।

১০ জানুয়ারী ১৮৭৩। সন্ন্যাসীর আদেশে মৌন ব্রত অবলম্বন করিলাম এবং তাহার সান্নিধ্যে অবস্থান করিলাম। আই-সি-এস রমেশচন্দ্র দত্ত ও উকীল রমেশচন্দ্র মিত্র তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া বেদের অনুবাদ ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত সন্ন্যাসীর বেদ সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

[পাদটীকা রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯ খৃঃ) ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আই-সি-এস্ হন। বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার, পরে বড়োদা রাজ্যের অর্থসচিবের পদে অধিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক উপন্যাস, রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, বঙ্গভাষার ইতিহাস ইত্যাদি তাহার অক্ষয় কীর্তি। রমেশচন্দ্র মিত্র (১৮৪০-১৮৯৯ খৃঃ) কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে আরুঢ় হন।]

১১-১৮ জানুয়ারী ১৮৭৩। সন্ন্যাসীর আদেশে আরও আট দিনের জন্য মৌন অবলম্বন করিলাম। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি যোগবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। লক্ষ্য করিলাম এই কয়েক দিনের মধ্যে সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, রজনীকান্ত গুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ গঙ্গুলি, গঙ্গাধর কবিরাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন।

[পাদটীকা-মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী (১৮৫০-১৯০৮ খৃঃ) ময়মনসিংহ জেলার আলাপসিংহ পরগণার জমিদার। মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর পুত্র শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীকে ইনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।]

[রজনী কান্ত গুপ্ত (১৯৪৯-১৯০০ খৃঃ) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও সুলেখক। পাণিনিবিচার, আর্যকীর্তি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।]

[ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৩ খৃঃ) এম-ডি, ডিএল, সি-আই-ই, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বিজ্ঞানসভার স্থাপয়িতা, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেললা, ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।]

[প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৮০-১৯০৫ খৃঃ) বিখ্যাত বক্তা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক, বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থের লেখক। ইনি চিকাগো ধর্ম মহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।]

[দ্বারকানাথ গঙ্গুলি (১৮৪৬-১৮৯৮ খৃঃ) ব্রাহ্ম সমাজের নেতা, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, সুলেখক, সুকবি, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ও ভারত সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও “অবলা বান্ধব” পত্রিকার স্থাপয়িতা। “না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না” কবিতাটি তাহারই রচিত।]

[গঙ্গাধর কবিরাজ (১৭৯৮-১৮৮৫ খৃঃ) নিপুণ চিকিৎসক, ৪০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। মুক্তবাধে ব্যাকরণের ও চরক সংহিতার সুবিস্তৃত টীকা লিখিয়া তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।]

১৯-২১ জানুয়ারী ১৮৭৩। ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ব্যস্ত রহিলাম। ২১শে জানুয়ারী মাঘোৎসবের দিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে দয়ানন্দ সন্ন্যাসীকে আমি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াশাকো রাজবাড়ীতে লইয়া আসিলাম। ব্রাহ্মসমাজের সব নেতাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজও বেদ বিষয়ে সকলের সঙ্গে সন্ন্যাসীর আলাপ আলোচনা হইল। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণের মুখে বেদমন্ত্র শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। তাহাকে রাজবাড়ীতে কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলাম তিনি সম্মত হইলেন না।

২১-৩০ জানুয়ারী ১৮৭৩। সন্ন্যাসী আমাকে নিভূতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে আদেশ দেওয়ায় বেহালায় এক নির্জন কুটীরে এই নয় দিন অবস্থান করিলাম। এই কয়েক দিন গুরুদেবের সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত রহিলাম। শুনিলাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাহার সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য গিয়াছিলেন।

[পাদটীকা-মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খৃঃ) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা। ইহার ১৪টি পুত্র কন্যা, যথা-দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুকুমারী, শরকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, পুর্ণেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, ররীন্দ্রনাথ (বিশ্বকবি) ও বুধেন্দ্রনাথ।]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খৃঃ) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলার বিদ্যালয় সমূহের স্পেশাল ইন্সপেক্টর, বিভিন্ন গ্রন্থ রচয়িতা, বিধবা বিবাহ, আন্দোলনের প্রবর্তক। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসমাজের ছাত্র ছাড়া অন্য সমাজের ছাত্রদের জন্যও দ্বারোদঘাটন ইহারই কীর্তি।

৩১শে জানুয়ারী ১৮৭৩, গুরুদেব সন্ন্যাসী দয়ানন্দ বালুচরে কোন পরিচিত ব্যক্তির বাগানবাড়ীতে নিভৃত জীবন যাপন করিলেন। কলিকাতার অজস্র লোক সমাগম হইতে কয়েক দিনের বিরাম গ্রহণই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও বিশ্রাম।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩। গোরাচাঁদ দত্তের গৃহে সন্ন্যাসীর “ঈশ্বর ও ধর্ম” সম্বন্ধে বক্তৃতা। কেশবচন্দ্র সেন সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি। সংস্কৃত কলেজের বহু ছাত্র সঙ্গে করিয়া মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের যোগদান। সন্ন্যাসীর সংস্কৃত বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ। ন্যায়রত্ন বক্তৃতার হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন। অনুবাদে কদর্থকরা হইতেছে বলিয়া ছাত্রদের আপত্তি। ন্যায়রত্নের উদ্ভা প্রকাশ করিয়া সভা ত্যাগ।

২৪-২৮ ফেব্রুয়ারী। কেশবচন্দ্র সেনের কলুটোলাস্থ পিতৃগৃহে, আদিব্রাহ্মসমাজে, বেহালায়, খিদিরপুরেও কাশীপুরে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সন্ন্যাসীর বক্তৃতা ও ধর্মালোচনা।

১-১১ মার্চ ১৮৭৩। যোগসাধনার জন্য আমার বেহালায় নির্জন ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন। স্বামিজীর সঙ্গে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বার্তালাপ।

১৩ মার্চ ১৮৭৩। লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামীর সঙ্গে স্বামীজীর নবদ্বীপে উপস্থিতি।

১৪-১৮ মার্চ ১৮৭৩। ১৫ই নবদ্বীপে বাজারে ও ১৬ই গঙ্গাতীরে সভা। গুজব উঠিল-জার্মান সাহেব ম্যাক্সমুলার সন্ন্যাসীর বেশে নবদ্বীপের লোককে খৃষ্টান করিতে আসিয়াছে, শত সহস্র নরনারী তাহাকে দেখার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ লোকের নিকট অপদস্থ। কোন পণ্ডিত শাস্ত্রবিচারে অগ্রসর হইলেন না নবদ্বীপে গিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হইলাম।

১৯-২১ মার্চ ১৮৭৩। স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া বরাহনগরে ফিরিলাম।

২২-৩১ মার্চ ১৮৭৩। স্বামীজী নিঃসঙ্গ ভাবে গ্রন্থ প্রণয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিকালে তাহার উপদেশ হইল।

১লা এপ্রিল ১৮৭৩, দয়ানন্দের বরাহনগরত্যাগ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হুগলীতে উপস্থিতি। বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডলের বাগানবাড়ীতে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র সহিত স্বামীজীর প্রমোত্তর। রেভারেণ্ডের পরাজয়।

২-৫ এপ্রিল ১৮৭৩। বৃন্দাবনবাবুর গৃহে স্বামীজীর সংস্কৃতে বক্তৃতা। সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ভট্টপল্লীর পণ্ডিতেরা বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ।

৭-৮ এপ্রিল ১৮৭৩। ৮ই এপ্রিল ভট্টপল্লীর পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্নের (কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত) সহিত স্বামীজীর মূর্তিপূজা বিষয়ে শাস্ত্রবিচার। তারাচরণের পরাজয়।

৯-১২ এপ্রিল ১৮৭৩। মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হুগলীর বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর পরিভ্রমণ। : ১৩ এপ্রিল ১৮৭৩। স্বামীজীর বর্ধমানে উপস্থিতি। রাজা বনবিহারী কাপুর রাজবাড়ীতে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন।

১৪-১৫ এপ্রিল ১৮৭৩। বর্ধমান রাজবাড়ীতে স্বামীজীর উপদেশ। বহুলোকের সমাগম। রাজা বাহাদুরের ধর্মোপদেশ শুনিতে নিয়মিত যোগদান কিন্তু ঔদাসীন্য।

১৬ই এপ্রিল ১৮৭৩। স্বামীজীর বর্ধমান ত্যাগ ও ভাগলপুর অভিমুখে যাত্রা।

সমাপ্ত

****সন্দর্ভঃ বঙ্গে দয়ানন্দ - পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী ****

ষোড়শ সৎস্কার পরিচয় ও মানবজীবনে তাৎপর্য



সনাতনীদেব গর্ভধারণ থেকে শ্মশান পর্যন্ত বৈদিক সংস্কার ১৬ টি। মহর্ষি মনু [মনুস্মৃতি ২।১৬] বেদ দ্বারা এই ১৬ সংস্কার [যজুর্বেদ ৮।৩৩] নির্দেশিত বলেছেন। এগুলোকে একত্রে ষোড়শ সংস্কার বলা হয়। একজন ব্যক্তির উত্তম পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে বাধ্যতামূলকভাবে এই ষোড়শ সংস্কার পালন করা উচিত।

১] গর্ভাধানঃ [অথর্ববেদ ৬।৮১।২] গর্ভধারণ অর্থাৎ গর্ভাশয়ে বীর্যস্থাপন-স্থিरीকরণ যে ক্রিয়া দ্বারা হয় তাহাকে গর্ভাধান বলে। যার বীজ ও ক্ষেত্র উত্তম তার যেমন উত্তম ফসল উৎপন্ন হয়, তেমনই বলবান স্ত্রী - পুরুষের সন্তানও উত্তম হয়। এজন্য পূর্ণ যৌবন অবধি ব্রহ্মচর্য পালনের পর সমাবর্তনের মাধ্যমে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের বিধান রয়েছে।

২] পুংসবনঃ [অথর্ববেদ ৩।২৩।৬] পত্নী গর্ভবতী হয়েছেন জানার পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে সুস্থ সন্তান কামনায় পুংসবন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যজ্ঞ করা হয়। এই অনুষ্ঠান মূলত গর্ভাবস্থায় প্রসূতির সুস্থতার জন্য এবং সন্তান ঠিকভাবে ভূমিষ্ঠ হবার জন্য করা হয়।

৩] সীমান্তোন্নয়নঃ [ঋগ্বেদ ২।৩২।৪] এই সংস্কার দ্বারা গর্ভধারিণী স্ত্রীর মন আনন্দিত হয় এবং শরীর আরোগ্য লাভ করে। গর্ভমাস হতে চতুর্থ মাসে এ সংস্কার করতে হয়।

৪] জাতকর্মঃ [ঋগ্বেদ ৫।৭৮।৯] সন্তান প্রসবের সময় মন্ত্র জপ; মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নাভিচ্ছেদন, শিশুর যত্ন বিষয়ক কর্মসমূহকে জাতকর্ম সংস্কার বলা হয়।

৫] নামকরণঃ [যজুর্বেদ ৭।২৯] সন্তান জন্ম হওয়ার একাদশ তম দিনে আত্মীয় পরিজন ও পরিবারের ব্যক্তিদের সঙ্গে করে সন্তানের নাম রাখার সংস্কারকে নামকরণ সংস্কার বলে।

৬] নিষ্কুম্ভঃ [অথর্ববেদ ৮।২।১৪] ঘরের বাইরে শুদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্থানে সন্তানকে ভ্রমণ করানোর সংস্কারকে নিষ্কুম্ভ বলে। যে সময় ভাল মনে হবে, সে সময়েই ভ্রমণ করানো যাবে। চতুর্থ মাসে বা এর পরে ভ্রমণ করাতে হবে।

৭] অন্নপ্রাশনঃ [অথর্ববেদ ৮।২।১৯] যখন শিশু অন্ন জাতীয় খাদ্যাদি হজম করার উপযুক্ত শক্তি লাভ করবে, তখন মুখে অন্ন দেওয়াই অন্নপ্রাশন সংস্কার।

৮] চূড়াকর্মঃ [অথর্ববেদ ৬।৬৮।৩] শিশুর মস্তক মুগুন অর্থাৎ মাথার চুল ফেলে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে চূড়াকর্ম সংস্কার। ১ বছর বা ৩ বছর বয়সে এই সংস্কার পালন করতে হয়।

৯] কর্ণবেধঃ [অথর্ববেদ ৬।১৪১।২] শিশুর জন্মের তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে নাক ও কান ছিদ্র করাকে কর্ণবেধ বলা হয়। এই সংস্কার এখন প্রায় বিলুপ্ত বলা যায়। আমাদের এই সংস্কার গুলোর রক্ষা করা ও পালন করা উচিত।

১০] উপনয়নঃ [অথর্ববেদ ১১।৫।৩] যে সংস্কার দ্বারা শিষ্যকে গুরুর সাহচর্যে শিক্ষাগ্রহণ করে বিদ্বান ব্যক্তিতে পরিণত হতে নিয়ে যাওয়া হয় তার নাম “উপনয়ন”। এই সংস্কারের মাধ্যমে গুরু তার শিষ্যকে যজ্ঞোপবীত দিয়ে দীক্ষিত করেন। উপনয়ন বর্তমানে কেবল এক বর্ণের জন্য প্রচলিত থাকলেও বৈদিক কর্মগত বর্ণব্যবস্থা অনুযায়ী এটি আবশ্যিক সংস্কার যা নারী পুরুষ, বর্ণ নির্বিশেষে বাধ্যতামূলক। উপনয়নের স্বীকৃতির মাধ্যমেই মানব দ্বিজত্ব লাভ করে ও শাস্ত্রচর্চাদি কর্মে অধিকার লাভ করে।

১১] বেদারম্ভঃ [অথর্ববেদ ১১।৫।২৪] গায়ত্রী মন্ত্র থেকে শুরু করে চারবেদ অধ্যয়নের জন্য যে নিয়ম-ধারণ করতে হয়, তাকে বেদারম্ভ সংস্কার বলে। যেদিন উপনয়ন হয় সেদিনই এই সংস্কার করতে পারে। অথবা ১ বছরের মধ্য করতে হয়।

১২] সমাবর্তনঃ [ঋগ্বেদ ৩।৮।৪] শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুগৃহ থেকে গৃহে ফিরে গৃহস্থশ্রম গ্রহণের জন্য সমাবর্তন সংস্কার পালন করা হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এমন অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে।

১৩] বিবাহঃ [অথর্ববেদ ১১।৫।১৮] সমাবর্তনের পর গৃহশ্রমের জন্য শুভ গুণ কর্ম ও স্বভাবের দিক দিয়ে সকলদিক দিয়ে তুল্য ও প্রীতিযুক্ত হয়ে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনই বিবাহ সংস্কার। বিয়ের পর গৃহশ্রমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ লাভের জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পরোপকার করা, ঈশ্বর উপাসনা ও গৃহকর্ম করা, সত্যধর্মে একনিষ্ঠ হওয়া এবং ধর্মানুসারে চলা কর্তব্য।

১৪] বানপ্রস্থঃ [ঋগ্বেদ ১০।১৪৬।৫] বিবাহের পরে ধর্মানুসারে সন্তান প্রাপ্তি সহ সংসারের কাজ শেষ করে মহাত্মাগণের সহিত যোগাভ্যাস, শাস্ত্র আলোচনা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভের প্রযত্ন করাকে বানপ্রস্থ সংস্কার বা গৃহশ্রমসংস্কার বলে।

১৫] সন্ন্যাসঃ [ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৪] সংসারের মায়া মোহত্যাগ ও পক্ষপাত ত্যাগ করে, বৈরাগ্যবান হয়ে পরোপকারের জন্য ও সমাজের কল্যাণের জন্য পরিভ্রমণ করা সন্ন্যাস সংস্কার।

১৬] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াঃ [যজুর্বেদ ৪০।১৫] মৃত্যুর পর দাহকার্য সম্পাদন করা অর্থাৎ অন্তিম সংস্কারকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই শেষ সংস্কার। এরপর শরীরের জন্য অন্য কোনো সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে না। এর নাম নরমেধ, পুরুষমেধ, নর যাগ ও পুরুষ যাগ। শ্মশান ভূমিতে জ্বলন্ত চিতায় সমিধা, সুগন্ধি, রোগনাশক ওষধি এবং ঘৃত আছতি দ্বারা মৃত শরীরকে ভস্মীভূত করাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। জীব তার কৃত কর্মের ফল নিজেই ভোগ করে। বংশধরদের শ্রাদ্ধাদি কোনো কার্যই তাকে সাহায্য করতে পারে না। বেদ নির্ধারিত এই ১৬ সংস্কারের পালন ও রক্ষণ প্রত্যেক সনাতনীর জন্য একান্ত কর্তব্য। এগুলো পালনের পদ্ধতির জন্য মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী রচিত “সংস্কার বিধি” পুস্তক দ্রষ্টব্য।



পঞ্চমহাযজ্ঞ কী ? ও কিভাবে করা হয় ?



আমরা ৫টি জায়গায় প্রতিদিন অজ্ঞাতসারে পাপ বা হিংসা করি -

পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যপঙ্করঃ ।
কণ্ডনী চোদকুন্তশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ ॥
তাসাং ক্রমেণ সর্বাসাং নিকৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ ।
পঞ্চ ক্লৃপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্ ॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মায়ম্যজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥
মনুস্মৃতি ৩।৬৮-৭০

অনুবাদঃ চুল্লী, জাঁতা বা শিল নোড়া, উপস্কার বা হাড়িকড়া, কন্ডনী বা ঢেকি ও কলসী এই পাঁচটির নাম সূনা বা পশুবধস্থান। এগুলো নিয়ে কাজ করতে গেলে অজ্ঞাতসারে যে প্রাণিহিংসা ঘটে, তার জন্য গৃহস্থকে পাপে লিপ্ত হতে হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি থেকে উৎপন্ন পাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থদের পক্ষে যথাক্রমে পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন।

বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মায়জ্ঞ, অন্ন উদকাদির দ্বারা জীবিত পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধা সহকারে তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিতে প্রক্ষেপরূপ হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পশুপাখি, কৃমি, কুকুর, বেড়াল, অধম, পাপীকে খাওয়ানোর নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ।

মহর্ষি যাস্কাচার্য লিখিত বৈদিক শব্দকোষ নিরুক্তে [৭।১] বলা হয়েছে-

“য়ৎকাম ঋষির্যেস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ততিং প্রযুক্তে তদৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি ॥”

অর্থাৎ যখন ঈশ্বর কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে আমাদের মন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেন তখন মন্ত্রের সেই বিষয়টিকে দেবতা বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদ ১০।১৫১ এর দেবতা হলো ‘শ্রদ্ধা’ এবং এই সূক্তের আলোচ্য বিষয় হলো ঈশ্বর ও গুরুজনে শ্রদ্ধা বা সম্মান। ঋগ্বেদ ১০।১১৭ এর দেবতা হলো ‘ধনদানপ্রশাংসা’ এবং এই সূক্তের মন্ত্রসমূহের আলোচ্য বিষয় হলো গরীবদুঃখীদের দানে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। ঋগ্বেদ ১০।১৪৬ এর দেবতা হলো ‘দ্যুতিনন্দা’ এবং তাই এর আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো জুয়াখেলার অপকারিতা ও নিষিদ্ধতা। ঋগ্বেদ এর প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দেবতা হলো ‘অগ্নি’। আজ ম্যাক্সমুলার সহ বিদেশী মিশনারীদের অপপ্রচারের কারণে একে সবাই নির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত আলাদা একটি দেবতা মনে করে,

যদিও তা সম্পূর্ণ ভুল।

* উপযোগের দেব -

এই তেত্রিশ প্রকার দেব এর মধ্যে কেবল জীবাত্মা চেতন। ইহা অন্যের উপযোগ করে অথবা স্বয়ং অন্য জীবাত্মার উপযোগে আসে। যেমন গাভী দুধ দিয়ে, ভেড়া উণ [লোম] দিয়ে, যাঁড় হাল চাষের উপযোগে আসে। তেমনি সৈনিক, বৈদ্য আদিও উপযোগে আসে। জীবাত্মার অতিরিক্ত শেষ বত্রিশ দেব জড় এবং উপযোগের দেব বলা হয়।

* ব্যবহারের দেব -

মাতা, পিতা, আচার্য, অতিথি এবং পতি-পত্নী দ্বারা সংসারের ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এ জন্য এই পাঁচ কে ব্যবহারের দেব বলা হয়।

এই পাঁচজন বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ দেব-দেবী। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আমরা এইরূপ দেবতাদেরই দেখতে পাই এবং তাদের পূজনের কথা পাই। “মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।” তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।২। তবে দেব হবেন তিনিই, যাঁর মধ্যে উত্তম গুণাবলী তথা বিভিন্ন দৈবী সম্পদ [গীতা ১৬।১-৩] রয়েছে। পিতামাতা, আচার্য, পতি-পত্নী প্রত্যেকে আদর্শ আচরণ না করলে তারা দেব হিসেবে আখ্যার যোগ্য হবেন না।

গীতায় বলা আছে যে যজ্ঞ সম্পন্ন হলে দেব বা বিদ্বান ইষ্টকে অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পন্নকারীকে ফল দান করবেন। অর্থাৎ গীতা ও মনুস্মৃতিতে যে দেবযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে তা নিরুক্ত অনুসারে মূলত বিদ্বান মানবদের ও পরিবেশের শুদ্ধিকারী দেবযজ্ঞের কথা।

আর এই ধরনের যজ্ঞ কেন করবেন ও করলে কি হয় তাও একবার দেখুন-

অনাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদনসম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৩/১৪

অর্থ: সকল প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি হয় বৃষ্টি থেকে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ দ্বারা এবং যজ্ঞ কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মান্ধ্রসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩/১৫

অর্থ: কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। বেদ অবিনাশী অন্ধ্র থেকে উৎপন্ন। সেজন্য সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিত্য (সবসময়) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

অন্ধ্র শব্দে ক্ষয় রহিত পরমাত্মাকে বুঝানো হয়েছে (মুণ্ডক উপনিষদ : ১/১/৭)। রাঢ়ীন টীকাকারেরা বলেছেন - ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝাতে হবে এবং অন্ধ্র শব্দে পরমাত্মা। তবে কেউ কেউ প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝেছেন, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে পরমব্রহ্ম বুঝেছেন। তা না হলে অর্থের অসঙ্গতি হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝেছেন। অর্থাৎ ‘বেদ সর্বার্থ প্রকাশক হেতু নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।’ তবে এজন্য মূল তাৎপর্যের কোনো সমস্যা হয় না। পাঠক যেকোনো একটি অনুবাদ গ্রহণ করতে পারে। আমরা এই স্থানে শ্রীধর স্বামী, কেশবনাথদত্ত, বিশ্বনাথ ইত্যাদি বহু প্রচলিত টীকাকারের অর্থ গ্রহণ করেছি।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩/১৬

অর্থ: হে পার্থ (অর্জুন) ! যে এই পৃথিবীতে এই প্রকার প্রবর্তিত চক্র অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগী পাপময় ব্যর্থ জীবন ধারণ করে।

‘প্রবর্তিত’ শব্দে উপরে উল্লেখিত কর্মকে বুঝানো হয়েছে। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন যে, গীতা ও বৈদিক গ্রন্থসমূহে যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতা পূজা বলতে কি বুঝানো হয়েছে।

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিযৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যত্মকারণাৎ ॥ ৩/১৩

অর্থ:- যজ্ঞে অবশিষ্ট অন্নের ভোগকারী শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। আর যে পাপী (শুধুমাত্র) নিজের শরীর পালনের জন্য পচন [রান্না] করে তারা তো পাপকেই ভোজন করে।

এখানে ‘যজ্ঞ’ শব্দে পঞ্চমহাযজ্ঞ বুঝানো হয়েছে।

- * ১। ব্রহ্মযজ্ঞ (শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সন্তোষাপাসনা),
- * ২। দেবযজ্ঞ (হবন অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে যে যজ্ঞ করা হয়),
- * ৩। পিতৃযজ্ঞ (পিতা-মাতা সহ গুরুজনদের শ্রদ্ধার সাথে সেবা করা),
- * ৪। অতিথিযজ্ঞ (ধর্মান্না অতিথিদের সেবা করা),
- * ৫। ভূতযজ্ঞ (প্রাণীদের সেবা করা)

এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর অবশিষ্ট অন্ন ভোগকারী পাপমুক্ত হয়।

ঋগ্বেদ ১০.১১৭.৬ এবলা হয়েছে -

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্ৰচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য ।

নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥

অর্থ:- উদার চিত্তরহিত, অদূরদর্শী, ক্ষুদ্রজ্ঞানী ব্যক্তির ধন উপার্জন ও অন্নাদি ভোজন সবই ব্যর্থ হয়। আমি সত্য বলছি যে, ঐসব ধন বৈভব তার জন্য মৃত্যুস্বরূপ। যে ব্যক্তি অন্নাদি দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি অথবা তার আত্মীয় স্বজনকে পালন পোষণ করে না, প্রকৃতপক্ষে সেই একলা ভোজনকারী ব্যক্তি শুধু পাপই ভোজন করে অর্থাৎ সে পাপী হয়।

উক্ত শ্লোকের ভাব মনুস্মৃতিতেও সরাসরি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে -

পৈংগুন্যো মহাঅয়জ্ঞান্ন হাপয়তি শক্তিতঃ ।

স গৃহেহপি বসন্নিত্যং সূনাদৌষৈর্ন লিপ্যতে ॥

মনুস্মৃতি ৩।৭১

অনুবাদঃ যে গৃহস্থ প্রতিদিন পূর্বোক্ত পাঁচটি মহাযজ্ঞ যথাসম্ভব পরিত্যাগ না করেন, তিনি গৃহস্থশ্রমে বাস করেও সূনা বা পশুবধস্থান জনিত দোষে লিপ্ত হন না।

পঞ্চমহাযজ্ঞের বৈদিক প্রমাণ ও পালন পদ্ধতি

প্রথম ব্রহ্মযজ্ঞ, [ঋগ্বেদ ১।৬।১] ব্রহ্মযজ্ঞ হলো ব্রহ্মকে জানার প্রচেষ্টা। পশুজন্মের সাথে মানবজন্মের পার্থক্য কী? একটি পশু আহার করে, ঘুমায়, মৈথুন করে। একজন মানুষের জীবনও যদি আহার, নিদ্রা, মৈথুনেই কেটে যায়, তাহলে পশুর সাথে তার পার্থক্য কী! ঈশ্বর আমাদের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যযোনী দিয়েছেন, বর্তমান মনুষ্য জন্মকে সার্থক তখনই করতে পারি, যদি আমরা এই দুর্লভ জন্মকে ব্রহ্ম সাধনার কাজে লাগাই। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পশ্বা বিদ্যতেহ্যনায়। [যজুর্বেদ ৩১।১৮]। এই ব্রহ্মকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তির আশ্রয় আর কোনো উপায় নেই। এভাবেই আমরা ক্রমান্বয়ে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিরূপ মোক্ষের দিকে ধাবমান হতে পারব। ব্রহ্মকে জানার যেকোনো প্রচেষ্টাই ব্রহ্মযজ্ঞ। সাধারণত যোগ, প্রাণায়াম, স্বাধ্যায় [শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন], অধ্যাপনা, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনা এসকলই ব্রহ্মযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ, [ঋগ্বেদ ৮।৪৪।১, যজুর্বেদ ৩।১, যজুর্বেদ ১২।৩০] নিত্য অগ্নিহোত্রসহ সকল যজ্ঞ, প্রাকৃতিক দেবের পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে হবি অর্পণ, বিদ্বানগণের সংসর্গ লাভ ও সেবা করাই দেবযজ্ঞ। গীতায় আছে, তাই প্রতিদিন কিংবা বিশেষ তিথিতে কাষ্ঠ, নানা আহার্য শস্যদ্রব্য, ঘৃত, সুগন্ধি মশলা, কেসর, জাফরান, পুষ্প প্রভৃতি দিয়ে যজ্ঞ করতে হবে। নানা সুগন্ধি দ্রব্য হবি দেয়ার ফলে বায়ু বিশুদ্ধ ও নিরোগ থাকে।

তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ, [যজুর্বেদ ২।৩৪] আমাদের প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, পিতামহ-পিতামহী, মাতা-পিতা, স্বগোত্রীয় কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরু বা আচার্য তথা অন্য যেকোনো বিদ্বান্ বা শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা অনুভবপ্রবীণ, জ্ঞানপ্রবীণ ও মান-সম্মান পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে ‘পিতর’ বলা হয়। তাদের যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের সাথে ভালো আচরণ ও তাঁদের শ্রদ্ধা করাই পিতৃযজ্ঞ। ‘য়ে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে’, [যজুর্বেদ ১৯।৪৫] ‘পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ’, [যজুর্বেদ ১৯।৩৬] পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহাদির তথা ‘নমো বঃ পিতরো রসায়’ ইত্যাদি মন্ত্র [যজুর্বেদ ২।৩২] পিতরদের সেবা ও সৎকার করার পক্ষে প্রমাণস্বরূপ। ‘অহতৌ পিতরৌ ময়া’ [যজুর্বেদ ১৯।১১] = আমার মাধ্যমে যেন আমার মা-বাবা কষ্ট না পায়।

এ বিষয়ে মহর্ষি মনু বলেছেন

“কুর্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।

পয়োমূলফলৈর্বাথপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্ ॥

[মনুস্মৃতি ৩।৮২]”

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজ্য পদার্থ এবং জল, দুধ, কন্দমূল, ফল ইত্যাদি দ্বারা পিতরদের প্রসন্নতার জন্য প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করবে অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে পিতামাতার সেবা-সৎকার করবে। এখানে ভগবান্ মনু স্পষ্টভাবে জীবিত পিতরদের সেবা করার জন্য বিধান দিয়েছেন এবং সেটি প্রতিদিন করতে বলেছেন। প্রসঙ্গত অন্ত্যেষ্টিক্রম ব্যতীত পৃথক কোনো কর্ম মৃতের জন্য দ্বিতীয়বার কর্তব্য নয়। মূলত ‘শ্রাদ্ধ’ শব্দের মূল অর্থ শ্রদ্ধা, “শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া যৎ ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধম্।” অর্থাৎ যে ক্রিয়া

দ্বারা সত্যকে গ্রহণ করা যায় তার নাম শ্রদ্ধা এবং যা শ্রদ্ধা সহকারে করা যায়, তার নাম শ্রাদ্ধ। মৃত্যুর পরে তো জীব কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে গমন করে, অতএব মৃত্যুর ১৫ দিন বা ১ মাস পরে কোনো অনুষ্ঠান করে তাদের তৃপ্তি বা সেবা কখনো সম্ভব নয়। আর মাতা, পিতা, পুত্রাদি সম্বন্ধ শারীরিক। শরীর নষ্ট হওয়ার পর কে কার পিতা আর কে কার পুত্র? অতএব জীবিতকালে শ্রাদ্ধ করাই বৈদিক নিত্যকর্ম। চতুর্থ ভূতযজ্ঞ হলো জগতের সকল মানুষ ও পশুপাখির কল্যাণ কামনা ও তাদের সর্বদাই যথাসাধ্য সাহায্য করা [ঋগ্বেদ ২।১৩।৪]। “দ্বিপাদব চতুষ্পাৎ পাহি” [যজুর্বেদ ১৪।৮] দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ প্রাণীদের সংরক্ষণ করো। “উর্জম্ নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে” [যজুর্বেদ ১১।৮৩] সকল দ্বিপদী ও চতুষ্পদী বৃদ্ধি ও পুষ্টিপ্রাপ্ত হোক- এভাবেই পবিত্র বেদে সকল প্রাণীর সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। মানব ও পশুর প্রতি আমাদের সর্বদাই উত্তম আচরণ করা উচিত। আমরা অসুস্থ মানবের সেবা করতে পারি, দুঃস্থদের সাহায্য করতে পারি, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিতে পারি, অবলা প্রাণীর জন্যও আহার, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারি। এসবই ভূতযজ্ঞ। শুনাং চ পতিতানাং চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্। বয়সানাং কৃমীনাং চ শনকৈর্নির্বপেদ্ ভুবি ॥ [মনু ৩।৯২] কুকুরাদি পশু, পতিত ব্যক্তি, অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি, কুষ্ঠাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী, কাক আদি পক্ষী ও পিপড়া আদি কীটের জন্যে খাদ্যদ্রব্যের ছয় ভাগ আলাদাভাবে ভাগ করে দেওয়া ও তাদেরকে সদা প্রসন্ন রাখা উচিত।

পঞ্চম ‘অতিথিযজ্ঞ’ অতিথিদের যথাযথ সেবা। যিনি পূর্ণ বিদ্বান, পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, সত্যবাদী, ছল-কপট-রহিত, নিত্য ভ্রমণকারী মানুষ, তিনিই ‘অতিথি’। [অথর্ববেদ ৯।৬।[৩] ১-৮] কারো ঘরে যখন এসব গুণযুক্ত, সেবা করার যোগ্য অতিথি আসেন; তখন তাঁকে গৃহস্থ দাঁড়িয়ে নমস্কার করে, উত্তম আসনে বসাবেন। পরে গৃহস্থ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, “আপনার জল, খাদ্য বা অন্য কোনো বস্তুর ইচ্ছা হয় সেটা বলুন। হে অতিথি! যেভাবে আপনার কামনা পূর্ণ হয়, আমরা সেভাবেই আপনার সেবা করবো।” এভাবেই আমরা পরস্পর সেবা ও সংসঙ্গপূর্বক বিদ্যাবৃদ্ধি দ্বারা সর্বদা আনন্দে থাকতে পারি।





ঋষি কে ?

বেদমাতা জানাচ্ছেন -

প্রত্যর্ধিযজ্ঞানামশ্বহয়ো রথানাম্ ।

ঋষিঃ স যো মনুর্হিতো বিপ্রস্য যাবয়ৎসখঃ ॥

ঋগ্বেদ ১০।২৬।৫

অনুবাদঃ (ঋষিঃ সং) তিনিই ঋষি (যঃ) যিনি (যজ্ঞানাং প্রতি অর্ধিঃ) যজ্ঞসমূহের প্রতিপাদক , যজ্ঞের ন্যায় শুদ্ধ - পবিত্র ও নিষ্পাপ (রথানাম্ অশ্ব-হয়ঃ) যে রথ = জীবনরথের প্রেরণাদাতা , শীঘ্র সঞ্চালক, শুভকর্মের প্রাণস্বরূপ, (মনুঃ হিতঃ) যিনি মানবমাত্রের শুভাকাজ্জী ও কল্যাণকামী (বিপ্রস্য সখঃ) যিনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও ধার্মিক মানবের সখা , (যাবয়ৎ) যিনি সর্বদুঃখের দূরকারী ।

বিভিন্ন শাস্ত্রে ঋষি শব্দের তাৎপর্য ও সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে । বেদে ঋষি শব্দের উক্ত পরিভাষা অদ্ভুত, অপূর্ব ও অনুপম । ঋষির লক্ষণকে আমরা নিম্নোক্তরূপে চিহ্নিত করতে পারি -

১। যজ্ঞ = শুভকর্মের সম্পাদক, যজ্ঞের মতই পবিত্র ও শুদ্ধ । যজ্ঞ বৈ শ্রেষ্ঠকর্মম্ ।

২। প্রেরক = ঋষি সাধারণ মানবকে বেদোক্ত পথে চলতে সহায়তা করেন, তাকে নীতি ও নৈতিকতার পথে ধাবিত করেন । কখনোই তাকে ভ্রান্তিতে ফেলেন না ।

৩। শুভাকাজ্জী = ঋষি সর্বভূতে সমদর্শী হন । তার কাছে কোন ভেদাভেদ নেই । তিনি চান সকলেই যেন কল্যাণ ও সুখ লাভ করে ।

৪। ঋষি মাত্রেই বুদ্ধিমান, জ্ঞানী হবেন । কেননা শাস্ত্রসমূহকে মণ্ডন করে তিনি অমৃততত্ত্ব আশ্বাদন করেছেন । তিনি কোন মানবের শত্রু নন । বরং তিনি তাদের মনের অন্ধকারকে বিনষ্ট করে পরমবন্ধুর ন্যায় কাজ করেন ।

৫। উক্ত বন্ধুর ন্যায় হিতকামী বলেই তিনি সাধারণের দুঃখ দূর করতে সচেষ্ট থাকেন ।

সন্দর্ভঃ বেদ সৌরভ - স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সরস্বতী



ভজন, কীর্তন ও স্তোত্র বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে গান হিঙ্গেবে গীত করার বৈদিক নির্দেশনা আছে কি ?

হ্যাঁ রয়েছে। যজুর্বেদে [৩০।২০] গানের জন্য বীণাবাদকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে [৩।২।৫] শিরস্, উদর, অন্ত্র, তন্ত্র / তন্তু বা তন্তি, সাধন কোণ, বাদন ইত্যাদি অংশের উল্লেখ আমরা পাই। ঋগ্বেদ [১।৮৫।১০] ও অথর্ববেদ [১০।৩২।৪] এ বীণার একটি বিশেষ প্রকার ‘বাণ’ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কাঠক সংহিতায় [৩৪।৫] একে শততন্তু বা শততন্ত্রীও বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর তার সংখ্যা ছিলো ১০০। ঢোল আদিকে দুন্দুভি বলা হয়। বেদে ঋ০ ১।২৮।৫, অথর্ব০ ৬।১২৬।১-৩ এ দুন্দুভির উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদ অনুযায়ী [৬।১২৬।৩] যুদ্ধক্ষেত্রে দুন্দুভি বাজানো হয়। সৈন্যদের উৎসাহ বর্ধনের জন্যই এরূপ করা হতো। আরো যেসব বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আমরা বেদে পাই তা নিম্নরূপ-

- * তুণব [বাঁশী] = [কা০ সং০ ২৩।৪]
- * যে বাজাতো তাকে তুণবধ্বম [যজু০ ৩০।১৯] বলা হয়
- * শঙ্খ = যে বাজায় তাকে বলা হয় শঙ্খধ্বম । [যজু০ ৩০।১৯]
- * আড়ম্বর [বড় ঢোল] =[যজু০ ৩০।১৯]
- * বাণীচী = বাঁশির মত । যুদ্ধে বাজানো হয় । [ঋ০ ৫।৭৫।৪]
- * তলব বা তবলা = যে বাজায় তাকে পাণিঘ্ন বলে । [যজু০ ৩০।২০]
- * সূর্মি = হারমোনিয়ামের মত । [কা০ সং০ ২১।৯, ঋ০ ৮।৬৯।১২]
- * ককরী = বীণা বা বীন । যে বাজায় তাকে ককরিক বলে [অথর্ব০ ২০।১৩২।৩]
- * গোধা = বীণা তুল্য [ঋ০ ৮।৬৯।৯, অথর্ব০ ২০।৯২।৬]
- * গর্গর = তানপুরা [ঋ০ ৮।৬৯।৯]
- * পিঙ্গা = ঢোলের মত । [ঐ]
- * বেণু = বাঁশী বা মুরলী । [ঋ০ ৮।৫৫।৩]
- * মঞ্জিরা, করতাল (cymbal) [অথর্ব০ ৪।৩৭।৫, ঋ০ ১০।১৪৬।২, তা০ ব্রা০ ২।৫।৪]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় [১।১৩] নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে -

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।

সহসৈবাভ্যহন্যস্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥

অনুবাদঃ তারপর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, ঢাক ও গোমুখ শিঙাসমূহ হঠাৎ একত্রে ধ্বনিত হয়ে এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হল।

অর্থাৎ - শঙ্খ, ভেরী [Bugles] , পণব [Trumpets] , আনক [Kettledrums], গোমুখ [বিশেষ প্রকার শিঙ্গা] ।

সামবেসে উপাসকের স্তোত্রগানের পদ্ধতির বর্ণনা হয়েছে নিম্নরূপে -

॥ ঋষিঃ উচ্যত্ব আঙ্গিরসঃ ॥ দেবতাঃ পবমানঃ সোমঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জ ॥

উত্তে শুশ্বাস ঈরতে সিন্ধোরূর্মেরিব স্বনঃ ।

বাণস্য চোদয়া পবিম্ ॥

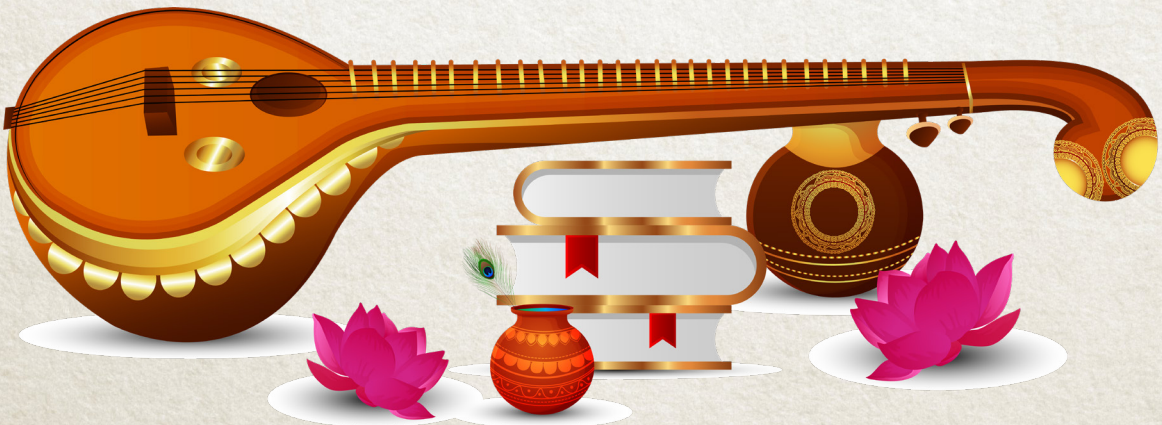
সামবেদ ১২০৫

পদার্থঃ হে ভক্তিসাধক উপাসক ! (তে) তোমার (শুশ্বাসঃ) বলবান্ স্তোত্রসমূহ (উদীরতে) উথিত হচ্ছে । তার (সিন্ধোঃ উর্মেঃ ইব) সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় (স্বনঃ) গীত ধ্বনি । তুমি (বাণস্য) বীণাদণ্ডের (পবিম্) তন্ত্রীকে (চোদয়) প্রেরিত করো, অর্থাৎ বীণা-বাদনের মাধ্যমে প্রভু-ভক্তির স্তোত্রকে তরঙ্গিত করো ।
সরলার্থঃ হে ভক্তিসাধক উপাসক ! তোমার বলবান্ স্তোত্রসমূহ উথিত হচ্ছে । তাঁর সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় গীত ধ্বনি । তুমি বীণাদণ্ডের তন্ত্রীকে প্রেরিত করো, অর্থাৎ বীণা-বাদনের মাধ্যমে প্রভু-ভক্তির স্তোত্রকে তরঙ্গিত করো ।

শাখাভেদে মন্ত্রটির অবস্থান -

(কৌথুম) উত্তরার্চিকঃ » প্রপাঠক » 5; অর্ধ-প্রপাঠক » 1; দশতিঃ » ; সূক্ত » 5; মন্ত্র » 1 (রাণানীয়)
উত্তরার্চিকঃ » অধ্যায় » 9; খণ্ড » 4; সূক্ত » 1; মন্ত্র » 1

অতএব বাদ্যযন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার স্তুতি কীর্তন বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত ।



आर्य समाज



आर्य समाजের ১৪৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহাশয়ের হাতে বেদ তুলে দিচ্ছেন আর্য সমাজের বিশিষ্ট কার্যকর্তাগণ। পাশে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রতজী এবং সিকিমের সাবেক রাজ্যপাল গঙ্গাপ্রসাদ চৌরাসিয়া।



आर्य समाजের ১৪৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ বিক্রম সম্বৎ ২০৮০ উপলক্ষে
আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।
অনুষ্ঠানের কিছু স্থিরচিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।



মহাভারতের গাথা অংশে আমরা যুধিষ্ঠির ও বেজির দানযজ্ঞের কাহিনী দেখতে পাই। কীভাবে যুধিষ্ঠিরের কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার দানযজ্ঞও লান হয়ে গিয়েছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের যবের ছাতুর সামান্য দানযজ্ঞের কাছে

একজন মা, তাঁর নাম শিলা রাণী দাস। তাঁর এক কন্যা একজন ভবিষ্যৎ চিকিৎসক, একটি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত। মেয়েটি বাংলাদেশ অগ্নিবীরের সাথে একদিন যোগাযোগ করে। সে বলল, তার মা একজন গৃহিণী। তিনি বহুবছর ধরে তিল তিল করে অল্প অল্প করে অর্থ সঞ্চয় করেছেন, উদ্দেশ্য একটিই। ভারতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রিয় তীর্থক্ষেত্রগুলো ভ্রমণ করবেন, মনের আশা মেটাবেন। কিন্তু বাংলাদেশ অগ্নিবীর পরিচালিত মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ট্রাস্টের দানকার্য দেখে তিনি তাঁর ইচ্ছে পরিবর্তন করলেন। তিনি এত বছরের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কয়েকটি দরিদ্র হিন্দু পরিবারের মাসিক অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করতে মনস্থির করলেন এবং বাংলাদেশ অগ্নিবীরকে তাঁর এই মহৎকর্মের দায়িত্বভার অর্পণ করলেন।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর পরিকল্পনা নিল কাজটি সম্পন্ন করবে এবং একজন ব্রহ্মচারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেদজ্ঞ আচার্যের হাতে যদি সেই দান সম্পন্ন করা যায় তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারেনা।

আর তাই বাংলাদেশ অগ্নিবীর দল অপেক্ষা করছিল আচার্য আনন্দ পুরুষার্থী জির আগমনের জন্য। তারই ধারাবাহিকতায় আজ ঠাকুরগাঁওয়ে তিনটি হতদরিদ্র সনাতনী পরিবারের মাঝে ৩ টি গোদান যজ্ঞ সম্পন্ন করা হলো আচার্যের হাতে। ১ম পরিবারের কর্তা একজন মৃগিরোগী ও কিছুটা বাক্ প্রতিবন্ধী, কোন জায়গা জমি ভিটেমাটি নেই, অনেক কষ্ট করে একটি হোটেলে কাজ করে পরিবার চালান। ২য় পরিবারের স্বামী স্ত্রী অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করছেন তারা। ৩য় জন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, তার ছেলের বৌ মারা যাবার পর ছেলে নাতি নাতনিকে ফেলে পালিয়ে গেছে। বৃদ্ধ নাতি নাতনিকে অনেক কষ্ট করে লালন পালন করছেন।

এই গোপালনের মাধ্যমে পরিবার ৩ টির ভবিষ্যৎ অর্থসংস্থানের একটি উপায় হবে এই আশা ও প্রার্থনা পরমেশ্বরের কাছে।

এখানেই শেষ নয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য অঞ্চলের আরও একটি পরিবারকে শিক্ষাবৃত্তি বা অনুরূপ কোন সহযোগিতা করা হবে এই মহিয়সী মায়ের দেয়া উপহাররূপ অর্থের মাধ্যমে। সে সংবাদটিও আপনাদের বিস্তারিত জানানো হবে পরবর্তীতে।

যেখানে অনেক ধনী প্রতিষ্ঠিত সনাতনীরাও দান করতে অনীহা প্রকাশ করেন সেখানে এই সনাতনী মা একজন গৃহিণী হয়েও নিজের সমস্ত জীবনের সকল সঞ্চয় দান করে দিলেন কিছু সনাতনী পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে। এই দান মহাভারতের সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের অমর দানের মতোই মহৎ। অনেক কোটিপতি ব্যক্তিরাই সমৃদ্ধির আশায়, পুণ্যের আশায় অনেক বড় বড় দান করেন, কিন্তু অপরের উপকারের আশায় নিজের সমস্ত সঞ্চয় দান করার মর্যাদা সবসময় ই অনন্য। শেষ করব মহর্ষি দয়ানন্দ দাতব্য সংস্থা - Maharshi Dayanand Charitable Trust র মোটো লাইন অমর অথর্ববেদীয় মন্ত্রটি দিয়ে-

শতহস্ত সমাহর

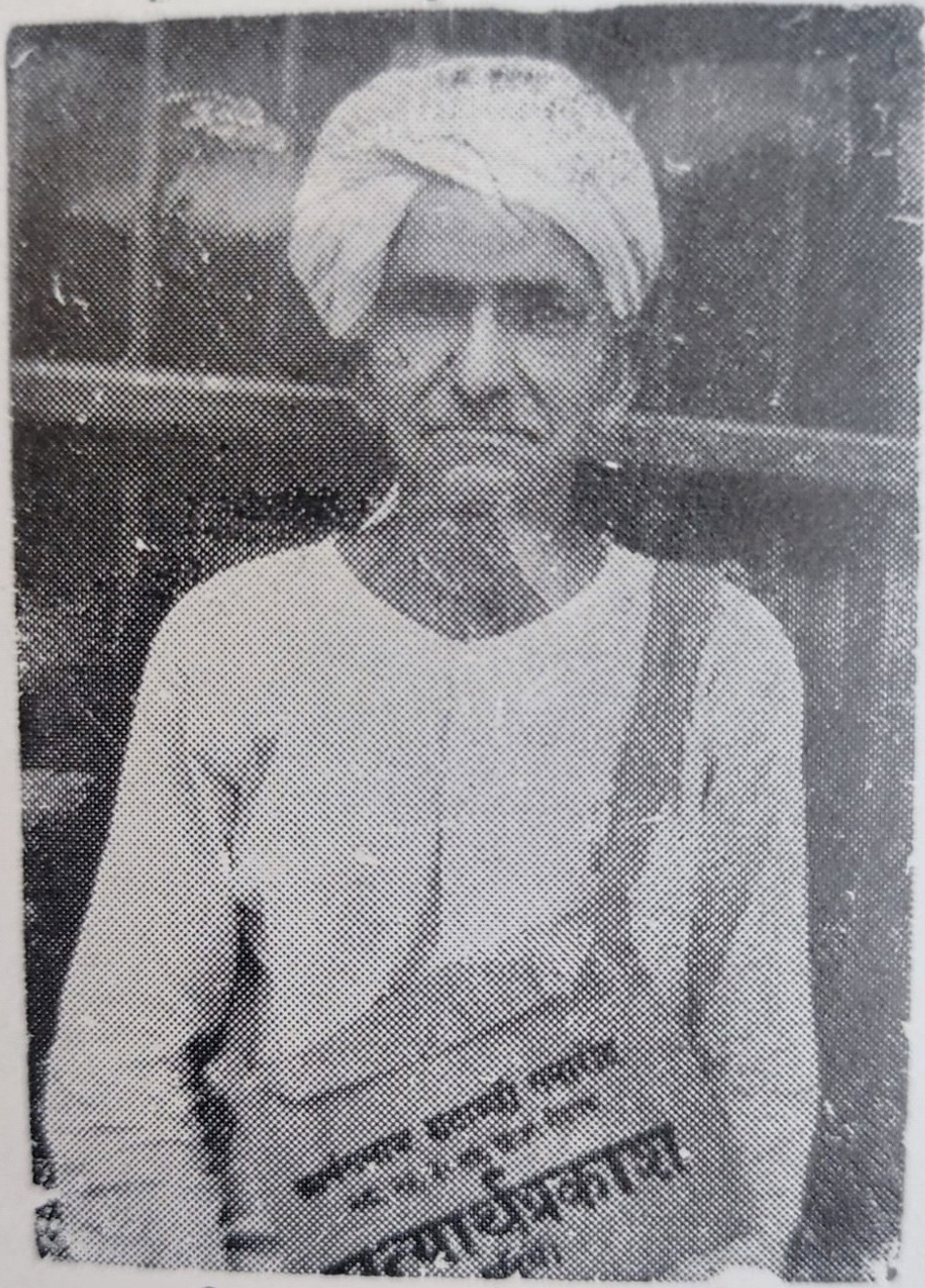
সহস্রহস্ত সং কির

আয় করতে হস্তটিকে শতটিতে বৃদ্ধি করো, দান করতে তাকে সহস্রটিতে রূপান্তরিত করো।

ওতম্ শান্তি শান্তি শান্তি



মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অগ্নিবীর, ঢাকা শাখা কর্তৃক
আয়োজিত উপনয়ন ও বেদারম্ভ সংস্কার-১৪২৯ বঙ্গাব্দের অন্তিম পর্বের কিছু স্থিরচিত্র



महाशय हरद्वारीलाल आर्य
आर्य गुरुकुल सिंहपुरा (रोहतक) के
संस्थापक

१९७५ साले आर्यसमाजेर १००तम प्रतिष्ठावार्षिकीते विनामूल्ये विरतण करा हयैछिल
सत्यार्थ प्रकाश

चित्रे सत्यार्थ प्रकाश शुभेच्छा संस्करण व्यागसह आर्य गुरुकुल सिंहपुरा , रोहतक ,
हरियाणार संस्थापक श्री हरद्वारीलाल आर्य ।

অথর্ববেদ বৃহস্প দশ মাথা ব্রাহ্মণ কে ?



ব্রাহ্মণো জজ্ঞে প্রথমো দশশীর্ষো দশাস্যঃ ।

স সোমং প্রথমঃ পপৌ স চকারারসং বিষম্ ॥

অথর্ববেদ ৪।৬।১

আক্ষরিক অনুবাদঃ এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হলো , যার দশ মাথা এবং দশ মুখ ছিলো । তিনি সোম পান করেছিলেন তথা বিষ কে নিষ্প্রভাব করে দিয়েছিলেন ।

ব্রহ্মের সন্তান রূপ হওয়ায় এই ব্রাহ্মণ হলো সূর্য । চার দিক, চার উপদিক , উর্ধ্বা ও ধ্রুবা এই দশ দিকে তার দশ মাথা, এবং তাতে ব্যাপ্ত রশ্মিপুঞ্জ তার দশ মুখ । এই মুখ গুলো দ্বারা তিনি ভূমিষ্ঠ রসের পান করেন তথা তিনি তেজ দিয়ে বিষ নিষ্প্রভাব করে দেন [ঋ০ ১।১৪৬।১] ।

কিংবা,

(প্রথমঃ) সমস্ত বর্ণের মধ্যে প্রধান, (দশশীর্ষঃ) দশ প্রকারের [১-দান, ২-শীল, ৩-ক্ষমা, ৪-বীর্য, ৫-ধ্যান, ৬-বুদ্ধি, ৭-সেনা, ৮-উপায়, ৯-গুপ্ত দূত, ও ১০-জ্ঞান] বলে মাথা স্থাপনকারী, এবং (দশাস্যঃ) দশ দিশায় মুখের সমান পোষণ শক্তিসম্পন্ন বা দশ দিশায় স্থিতিশীল (ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদবেত্তা মানব (জজ্ঞে) উৎপন্ন হয়েছে । (সঃ প্রথমঃ) সেই প্রধান পুরুষ (সোমম্) সোম নাম ঔষধির রস বা ব্রহ্মানন্দ রস (পপৌ) পান করেছেন, এবং (সঃ) তিনি (বিষম্) জাগতিক বিষ কিংবা বিষয়াসক্তি রূপ বিষকে (অরসম্) প্রভাবহীন করেছেন ।

অধ্যাত্মে

এই ব্রাহ্মণ হলো আত্মা । তার দশ প্রাণ তথা দশ ইন্দ্রিয়-রূপ দশ মাথা এবং দশ মুখ রয়েছে । তিনি অসরতায় সোমরস পান করেছিলেন, অতএব তিনি অমর, তথা তার উপর সাংসারিক বিষের প্রভাব পড়ে না । শরীর বিষে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে গেলেও, তারপরও আত্মা মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না ।

অনুবাদঃ শুভ্র দে



বেদ বহস্য গর্ভে বাছুর নিয়ে গাভী উড়ে কোথায় ? ও কেন যাচ্ছে ? অর্ধপথে ফিরে আসে কেন ?

শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ

বেদের অর্থ অনেক গহীন। পঞ্চাধিকরণে বেদ মন্ত্রের ত্রিবিধ ভাষ্য হয় - আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শুধুমাত্র বেদের আক্ষরিক অর্থ কখনোই সদর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য প্রদান করে না। বেদ রহস্য সিরিজে আমরা বেদেরই এমন কিছু মন্ত্রের স্বাধ্যায় করবো।

অবঃ পরেণ পর এনাবরেণ পদা বৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ।

সা কদ্রীচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎক স্বিৎসূতে নহি যুথে অন্তঃ ॥

[ঋ০ ১।১৬৪।১৭, অথর্ব০ ৯।৯।১৭]

আক্ষরিক অনুবাদঃ গাভী বৎসের পশ্চাৎভাগ সম্মুখের পদদ্বারা এবং সম্মুখভাগ পশ্চাতের পদদ্বারা ধারণ করতঃ উর্ধ্বমুখে যাইতেছেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন? কাহার জন্য অর্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন? কোথায় প্রসব করেন? যুথের মধ্যে প্রসব করেন না।

দেখুন, আক্ষরিকভাবে এই বেদমন্ত্রের তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু স্বয়ং বেদমাতা আমাদের এই অর্থ বুঝতে পথ প্রদর্শন করছেন।

১। যজ্ঞ ভূমিই গৌ আর অগ্নি তার বৎস [অথর্ব০ ৪।৩৯।২], যজ্ঞের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ কেবলমাত্র অগ্নি প্রদীপ্ত করা হয়নি তা গর্ভে বিদ্যমান। শীঘ্রই যজ্ঞ ভূমি বৎসকে জন্ম প্রদান করবে কেননা যখন সমস্ত সস্তার একত্র হয়ে যাবে তখন অগ্নি প্রদীপ্ত হবে। এই নিন গৌ বৎস প্রদান করেছে কিন্তু কোথায় ? গৌ হওয়া সত্ত্বেও গোযুথে নয়, যজ্ঞকুণ্ডে জন্মেছে।

২। যজ্ঞাহুতিই গৌ, যজ্ঞফল তার বৎস যজ্ঞাহুতি রূপ গৌ যজ্ঞফলকে অভ্যন্তরে রেখে উর্ধ্ব গমন করেছে [মনু০ ৩।৭৬]। কতক্ষণ করবে ? আদিত্যলোকে পৌঁছে তা বিশ্রান্ত হয়ে যজ্ঞকর্তাকে যজ্ঞফল প্রদান করে।

৩। আকাশস্থ মেঘ গৌ, তার গর্ভে বিদ্যমান জল বৎস স্বরূপ। [ঋ০ ১।১৬৪।২৮] সেই মেঘ-গৌ আকাশে উড়ন্ত। শীঘ্রই গর্ভস্থ জল বর্ষাধারা রূপে পতিত হবে। এটাই বৎসের জন্ম।

৪। অন্তরিক্ষ গৌ, বায়ু বৎস । [অথর্ব০ ৪।৩৯।৪] বায়ু অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে বদ্ধ রয়েছে । সকল প্রাণী ব্যাকুল হয়ে আছে, বায়ুর জন্মের অপেক্ষা করছে । শীতল মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলো, প্রাণ সঞ্চারিত হতে থাকলো । গাভী বৎসকে জন্ম প্রদান করলো ।

৫। সমস্ত দিক হচ্ছে গাভী, চন্দ্র তার বাছুর [অথর্ব০ ৪।৩৯।৮] পশ্চিম দিক গর্ভে চাঁদ বিদ্যমান, এখনো উদিত হয়নি । কিন্তু কখন উদিত হবে ? এই যে চন্দ্রোদয় হল । গাভী বাছুরকে জন্ম প্রদান করলো ।

৬। দুলোক হচ্ছে গৌ, আদিত্য হচ্ছে তার বৎস [অথর্ব০ ৪।৩৯।৬] । রাতের অন্ধকারে সূর্য বিলীন হয়ে আছে, তা দ্যৌর গর্ভে বিদ্যমান । কিন্তু সব সময় সূর্য গর্ভে প্রচ্ছন্ন থাকে না, শীঘ্রই সূর্য উদিত হবে । এই যে দেখুন - সূর্য উদিত হয়েছে । গাভী তার বাছুরকে জন্ম দিয়েছে ।

৭। বেদবাণী হচ্ছে গৌ বা গাভী [গো০ব্রা০ পূ০ ২।২১, তা০ব্রা০ ১৮।৯।২১] , তার রহস্যপূর্ণ অর্থ হচ্ছে তার বৎস । যারা বেদবাণী কেবল কণ্ঠস্থ করে, অর্থজ্ঞ হয় না তারা এমন মানবের ন্যায় যারা কিনা ঘাসের তৈরী গাভীর অন্বেষণ করে - যে গাভী না দুগ্ধ প্রদান করে, না বাছুরের জন্ম দেয় । [নিরু০ ১।১৮] কিন্তু যে বিবেকবান মানবগণ বেদার্থ অবগত হওয়া জন্য উৎসুক থাকে, তাদের জন্য বেদবাগ্-রূপিণী গৌ অর্থ রূপী বৎসকে উৎপন্ন করে । সে-ই বেদাধ্যয়নের সত্যিকারের ফল অর্থাৎ বেদবাক্ রূপিণী গাভীর দুগ্ধ লাভ করে । [শত০ ব্রা০ ১৪।৮।৯।১]

৮। প্রকৃতি গৌ, জগৎ তার বৎস । [ঋ০ ১০।১২৯।৪] সৃষ্ট্যুৎপত্তির পূর্বে সত্ত্ব-রজস্-তমস্ সাম্যাবস্থার প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে । জগৎপ্রপঞ্চ তার গর্ভে বিলীন থাকে । প্রকৃতিতে ক্রিয়া উৎপাদিত হলে জগৎরূপী বৎস উৎপন্ন হয় ।

শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ



পাই এর মান নির্ণয়ে ভ্রাতৃত্বম্ভের বিজ্ঞানীদের অবদান প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল

পাই(π) কী, বিজ্ঞানের ছাত্র মানেই তা জানেন। জগতে যত বৃত্ত আছে তার যেকোনটির পরিধিকে তার ব্যাস দিয়ে ভাগ করা হলো একই সংখ্যা হয়, বৃত্তটি একদম পিংপং বলের মতো ছোট হলেও তার পরিধিকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে হয় ৩.১৪১৫৯২৬.... বা ৩.১৪১৬ বলা যায়। আবার বৃত্তটি সূর্যের চেয়েও কোটিগুণ বড় হলেও তার পরিধিকে ব্যাস দিয়ে ভাগ করা হলে হয় ৩.১৪১৫৯২৬.... বা ৩.১৪১৬। জগতের এই আশ্চর্য রহস্যময় সংখ্যাটিকে বলা হয় পাই(π)।

যেহেতু আজ বছরের ৩য় মাসের ১৪ তারিখ তাই এই পাই (π) যার মান ৩.১৪১৫৯২৬ তার উদ্দেশ্যে দিবস পালন করা হয় মার্চের (৩য় মাসের) ১৪ তারিখ দুপুর ১ টা ৫৯ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে। এই পাইয়ের মান আবিষ্কার নিয়ে রয়েছে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস। আজ সেই প্রাচীন দিনের ই এই অঞ্চলের একটি লৌকিক গল্প বলব।

প্রাচীন কর্ণাটকের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ তিনি, নাম তাঁর ভাস্কর। লোকমুখে শোনা যায় একদিন নিজের মেয়ে লীলাবতীর ভাগ্য গণনা করে দেখলেন মেয়েকে বিয়ে দিলে মেয়ের পতিবিয়োগ ঘটবে। চিন্তিত ভাস্কর অনেক গণনা করে একদিন ১ ঘণ্টার একটি শুভমুহূর্ত বের করলেন। সেই ১ ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে দিতে পারলে কন্যা লীলাবতীর পতিবিয়োগ হবেনা। বিয়ের দিন যাতে কোনভাবেই সেই সময়টা পার না হয় তাই বানালেন একটি বালুঘড়ি, এই বালুঘড়ি থেকে সূর্যের আলোর বিক্ষেপের অনুপাতে বালু একটি ছিদ্র দিয়ে পড়তে থাকবে আর বুঝা যাবে সময় কত। মেয়েকে সাবধান করে দিলেন কোনভাবেই যাতে সেই ঘড়ি স্পর্শ না করে কারণ নষ্ট হয়ে গেলে বুঝা ই যাবে না কখন সেই এক ঘণ্টা সময় চলে গেছে কেননা তখনকার সময়ে তো ঘড়ি ছিলনা। কিন্তু হয় বিধি বাম। কন্যা তার কৌতূহল সামলাতে পারল না। ঠিক ই চুরি করে বাবার নজর এড়িয়ে দেখতে গেল সেই ঘড়ি। কখন যে অজান্তে নিজের পুঁতির মালা থেকে একটি পুঁতি খুলে বালুঘড়ির ছিদ্রে পরে বালুঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে খেয়াল ই করেনি কেউ!

যখন খেয়াল করল তখন সব শেষ। মনের দুঃখে ভাস্কর লিখলেন তাঁর কালজয়ী বই সিদ্ধান্ত শিরোমণি আর এর একটি অধ্যায় এর নাম রাখলেন লীলাবতী। মেয়ের সন্তান না হোক অন্তত তাঁর বইয়ের মাধ্যমেই মেয়ের নাম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে টিকে থাকুক! সেই বইতে লিখলেন-

ব্যাসে ভনন্দাগ্নিহতে বিভক্তে খবাণসূর্যৈঃ পরিধিঃ স সুক্ষ্ম।
 দ্বাবিশতিষ্মে বিহতেঃভ শৈলৈঃ স্থূলোঃভবা স্যাদ ব্যবহারযোগ্য।।
 (লীলাবতী,ক্ষেত্রব্যবহার,শ্লোক ৪০)

অর্থাৎ ৩৯২৭ কে ১২৫০ দিয়ে বিভক্ত করলে যা পাওয়া যায় তাকে বৃত্তের ব্যাস দিয়ে গুণ করলে বৃত্তের সুক্ষ্ম পরিধি হয়। আর ২২ কে ৭ দিয়ে ভাগ করে ব্যাস দ্বারা গুণ করলে ব্যবহারযোগ্য বৃত্তের স্থূল পরিধি পাওয়া যায়। অর্থাৎ পাই এর মান দাঁড়াল-

$$৩৯২৭ \div ১২৫০ = ৩.১৪১৬ \text{ এবং}$$

$$২২ \div ৭ = ৩...১৪১৬!$$

শুরুর গল্পটা আরও আগের। ঋষি বৌধায়ন খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ১০০০ বছর আগে তাঁর শুষ্ক সূত্রের ৪.১১২-১১৩ নং সূত্রে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত হওয়া উচিত -
 ত্রিপদপরিমাহানি বা ৩ অংকের ঘরের ৯০০:২৮৯ বা ৩.১১৪ যা কিনা ইতিহাসের কোন ব্যক্তির নির্ণয় করা পাই এর সর্বপ্রথম সবচেয়ে কাছাকাছি মান!

(বিঃ দ্রঃ শুভ সময় পার হয়ে যাবার গল্পটি কেবলই লৌকিক উপকথা, বৈদিক ধর্মীয় শাস্ত্রে এরকম শুভ সময় বা তা পার হয়ে গেলে অলৌকিক অমঙ্গল হয় এমন কিছুই ভিত্তি নেই)।

ভাস্করের প্রায় ৪০০ বছর আগে অষ্টম শতকে হুগলীর গণিতবিদ শ্রীধরাচার্য বললেন-

বৃত্তব্যাসস্ব কৃতের্মূলং পরিধির্ভবতি দশগুণায়া
 (ত্রিশতিকা, ক্ষেত্রব্যবহার, শ্লোক ১০)

অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাসের বর্গকে ১০ দিয়ে গুণ করে তাকে মূল করলে পরিধি প্রাপ্ত হয়।

তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ,

$$\text{পরিধি} = (\sqrt{\text{ব্যাস}^2 \times ১০})$$

$$\text{বা, } \sqrt{১০} = \text{পরিধি} \div \text{ব্যাস}$$

$$\text{বা, পরিধি} \div \text{ব্যাস অর্থাৎ } \pi = ৩.১৬২২!!!$$

একই কথা বিখ্যাত আর্য গণিতবিদ মহাবীর লিখলেন-

বৃত্তক্ষেত্রব্যাসো দশপদগুণিনে ভবেত পরিক্ষেপ
 (গণিতসারসংগ্রহ,ক্ষেত্র ব্যবহার,শ্লোক ৬০)

অর্থাৎ বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসকে ১০ এর বর্গমূল এর সাথে গুণ করলে তার পরিধি প্রাপ্ত হয়! অর্থাৎ পাই এর মান $\sqrt{১০}$ বা ৩.১৬২২!

তবে এক্ষেত্রে বিখ্যাত আৰ্য বিজ্ঞানী আৰ্যভট্ট চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন প্রথমবারের মতো নিখুঁতভাবে পাই এর গাণিতিক মান প্রকাশের জন্য যিনি প্রথমবারের মত এটিও আবিষ্কার করেছিলেন যে পাই এর মান নির্দিষ্ট নয় বরং এটি একটি অমূলদ তথা আসন্ন সংখ্যা। তার বিখ্যাত গ্রন্থ আৰ্যভাটিয়া এর দ্বিতীয় অধ্যায় গণিতপাদ এর দশ নং শ্লোক এ তিনি ৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন-

চতুরাধিকং শতম্ অষ্টগুনম্ দ্ব্যষ্টিস্তথা সহস্রাণাম্।

আয়ুতদ্ব্যবিক্রান্তস্য আসন্নো বৃত্তপরিণাহ।।

(আৰ্যভাটিয়া ২।১০)

অর্থাৎ চতুরাধিকং শতম্ মানে যদি ১০০ এর ৪ বেশীকে(১০০+৪=১০৪) অষ্টগুনম্ বা ৮ গুন করে তাকে দ্ব্যষ্টি বা ৬২ এর সহস্রাণাম বা ১০০০ গুন = ৬২০০০ এর সাথে যোগ করা হয় তাহলে আয়ুতদ্ব্য বা ১০০০০ এর ২ গুন তথা ২০০০০ একক ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি পাওয়া যাবে।

তাহলে চলুন হিসেবটা করি-

এখানে বৃত্তের পরিধি দাঁড়ায়

$$(১০৪ \times ৮ + ৬২০০০) \text{ এবং ব্যাস হল } ২০০০০।$$

আমরা জানি $\pi = \text{পরিধি} \div \text{ব্যাস}$ ।

তাহলে এখানে পাই এর মান পাই-

$$(১০৪ \times ৮ + ৬২০০০) \div ২০০০০ =$$

$$৬২৮৩২ \div ২০০০০$$

$$\text{অর্থাৎ } ৩.১৪১৬!!!!$$

এবং তিনি বলেও দিয়েছেন এই মান "আসন্নো" মানে আসন্ন অর্থাৎ দশমিক এর পরে চলতেই থাকবে যেমনটা আজ আমরা জানি π এর মান অসীম ৩.১৪১৫৯২৬....!

অবাক হবার আসলেই কোন শেষ নেই।

পাইয়ের ইতিহাসে অসীম ধারা ব্যবহারের যুগ সনাতনী যুগ বলে পরিচিত। পাইয়ের মান নির্ণয়ের জন্য অসীম ধারার ব্যবহার শুরু করে এক নবযুগের সূচনাও করেছিলেন একজন প্রাচীন ভারতবর্ষের গণিতবিদ, সংগ্রহামাত্রার মাধব।, তিনিই প্রথম অসীম ধারার সাথে পাইয়ের পরিচয় করে দেন। ১৫ শতকে মাধবের আরেক শিষ্য নীলকান্ত পাইয়ের মান নির্ণয়ের জন্য কার্যকরী আরেকটি ধারা আবিষ্কার করে যান।

এতোক্ষণ গেল প্রাচীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের অবদানের কথা -

আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন পাই এর মান নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি বিংশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় এবং কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারা আবিষ্কার করেছিলেন। এই ধারাটি প্রতি পদে ১৪ ঘর পর্যন্ত মান নিখুঁতভাবে বের করতে সক্ষম ছিলো।

আসুন নিচের ভিডিওটিতে দেখে নিই বৈদিক শাস্ত্রে পাই এর মান ও পিথাগোরাসের উপপাদ্য নিয়ে কি বলা হয়েছে! এভাবে হাজারো বছর ধরে পাই এর মান নির্ণয়ে ক্ষেত্রে ভারতীয় গণিতবিদ মনীষীগণ মহত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।



প্রকৃত শিবের সন্ধান

ডঃ বিবেক আর্ষ

অনুবাদকঃ শ্রী সোমনাথ ঘোষ



মহা শিবরাত্রির শুভ লগ্নে হরিভূমি সংবাদপত্রে রোহতক সংস্করণ পৃষ্ঠা ৬ ৪ এ প্রকাশিত ডঃ বিবেক আর্ষজীর নিবন্ধ।

(মহাশিবরাত্রি ও ঋষি বোধৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত)

আজ ঋষি বোধ দিবস, শিবরাত্রির পূণ্য উৎসব জ্ঞান, ভক্তি ও আরাধনার দিন। শিবরাত্রির তৃতীয় প্রহরে ১৪ বছরের বালক মূলশঙ্করের মনে সত্য শিবকে পাওয়ার আকাঙ্খা জেগে ছিল। শিব ঈশ্বরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রদাতা স্বরূপ। এই দিনে মূলশঙ্কর বোধ-জ্ঞান লাভ করেন এবং তিনি মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর হতে পেয়েছেন। প্রতি বছর এই দিনটিকে স্মরণ করে ঋষি দয়ানন্দ বোধোৎসব হিসাবে পালন করা হয়। শিবরাত্রি অর্থাৎ সেই কল্যাণময় রাত যা পৃথিবীতে বয়ে আনে সুখ, শান্তি ও আনন্দ। মানুষের জীবনে না জানি কত গুলো শিবরাত্রি আসে। কিন্তু সেখানে না আছে জ্ঞান, না আছে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার, না আছে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর লাভের প্রত্যাশা। জীবনের প্রথম শিবরাত্রিতে শিব মন্দিরে রাত্রি জাগরণ করলেন বালক মূলশঙ্কর। উনার পিতা এবং অন্যান্য ভক্তরা সবাই ঘুমিয়ে গেলেও উনি ঘুমোতে পারেন নি তাই তিনি সারা রাত জেগে ছিলেন। মধ্যরাতের পর একটা ছোট্ট ইঁদুর শিবের মূর্তিতে লাফালাফি করে মল ত্যাগ করতে দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগে যে এটা প্রকৃত শিব হতে পারে না। যে শিব নিজেকে রক্ষা করতে পারল না সে পৃথিবীকে কীভাবে রক্ষা করবে এবং তিনি এর উত্তর তার বাবার এবং পূজারীদের কাছে জানতে চান কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে উপবাস ভেঙ্গে দেন। এরপর তিনি ২১ বছর বয়সে যুবাবস্থায় সত্যিকারের শিবের সন্ধান গৃহত্যাগ করেন, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে দয়ানন্দ হন পরবর্তীতে মথুরায় স্বামী বীরজানন্দ দণ্ডীজীর শিষ্য হন। শিষ্যের গুরু প্রাপ্তি হয় এবং গুরু চিরকালের অভীষ্ট শিষ্য পায়। তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন অঙ্গ-উপাঙ্গ সহিত অধ্যয়ন করে গুরু দক্ষিণা হিসেবে নিজেকে দেশের জন্য সমর্পণ করেন।

যেই প্রকৃত শিবের সন্ধান দয়ানন্দ গৃহত্যাগ করেন, সেই পিপাসা বেদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ধর্ম অনুযায়ী আচরণ করে সন্তুষ্টি লাভ হয়েছিল। শিব ও শিবের যেসকল সমার্থক শব্দ আছে - শব্দু, শঙ্কর, ময়ঙ্কর, ময়োভব ইত্যাদি আছে, সেই সকল নামের অর্থ হল কল্যাণ ও সুখ। তিনি উপদেশ দেন যারা বিদ্যালাভ করে ধর্মাচারণ করেন তারাই সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হয়। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, সে অধর্মাচারণ ধীরে ধীরে আপনার সুখের শিকড় কেটে দিচ্ছে। ধর্মের ফল সুখ আর এই চিন্তাধারার

সাথে এই মূল মন্তব্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল কর্মই ধর্ম অনুযায়ী হোক। বস্তুত, শিবের রহস্য, মর্ম বা মার্গ ধর্মেরই আচরণ। ধূ ধাতু থেকেই ধর্ম উৎপত্তি। যার অর্থ ধারণ অর্থাৎ যার ধারণ, পালনে সুখ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ধর্মের একটি প্রধান তত্ত্ব এবং ঈশ্বর আনন্দ, সুখ, কল্যাণের ভাণ্ডার। হ্যাঁ, পরমাত্মার মুখ্য স্বরূপ হলো কর্ম ফল প্রদান করেন। অন্যান্য সকল গুণাবলী এর মধ্যেই চলে আসে। সুতরাং উত্তম ফল পেতে হলে উত্তম কর্ম ধর্মাচরণ করাই সুখের একমাত্র आधार। যেহেতু ধর্ম অর্থাৎ মঙ্গল, এর উপর স্থির থাকতে আমরা ধর্মগ্রন্থ পড়ি, সংসঙ্গ করি। এজন্য মনু মহারাজ ধৃতি, ক্ষমা, সংযম, সততা আদি দশটি গুণকে ধর্ম বলেছেন। যেসকল আচরণ সততার লক্ষণ। এগুলো পালনের মাধ্যমেই জীবন, পরিবার, সমাজ সুখী হয়। ধর্মের যত অর্থ পাওয়া যায়, তার আসল ভিত্তি হচ্ছে আচরণ। স্বামীজী নির্দেশ দিয়েছেন যারা ধর্মকে জানতে চায়, তাদের উচিত বেদ দ্বারা ধর্ম নির্ধারণ করা, কারণ ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় ব্যাতিত বেদের বেদের অর্থ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। বেদে শিবের মহিমার অনেক বিখ্যাত মন্ত আছে। ত্রৈলোক্যম্ যজামহে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে প্রার্থনা করি নানা জ্ঞান ভাণ্ডার, বিদ্যাভ্রমীর ভাণ্ডার, সুরক্ষিত আত্মবলের বর্ধক পরমাত্মার যজন করে। যেভাবে তরমুজ পাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রাক্ষালতা থেকে নিজে নিজে আলাদা হয়ে যায়, তেমনি মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে, মোক্ষ থেকে বিরত না হয়। সন্ধ্যোপাসনার প্রসিদ্ধ মন্ত্র নমঃ শম্ভবায় চ তে এই প্রেরণা প্রাপ্ত হয় যে, যে মানুষ সুখ প্রাপ্তিকারক পরমেশ্বর এবং সুখ প্রাপ্তির কারণ হেতু বিদ্বানদেরও সৎকার কল্যাণ করে এবং সকল জীবের সুখদায়কেরও সৎকার মঙ্গলকারী এবং অত্যন্ত মঙ্গলস্বরূপ পুরুষেরও সৎকার করে সে কল্যাণকে প্রাপ্ত হয়। বেদের বিখ্যাত রুদ্র সূক্তের মধ্যে ঈশ্বরকে দুষ্টিদের ভয় প্রদায়ক এবং শ্রেষ্ঠদের সুখদায়ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রোগনাশক বৈদ্যরূপে রোগ নিরাময়কারক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

মহর্ষি বেদের মধ্য দিয়ে সত্য শিবের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। এই ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণাই উনাকে মহাপুরুষের কোঠায় স্থাপন করে। উনার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল প্রেরণাদায়ক। একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবন কেমন হওয়া উচিত তিনি এর উদাহরণ ছিলেন। তাদের জীবনে কথা আর কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এজন্য যারা উনার সংস্পর্শে এসেছে তারা উনার আদর্শে প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেন নি। উনি প্রতিদিন আত্ম-কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের ধ্যান করতেন। এরই ফল হলো উনার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদের সময়ও উনি ভয় পায়নি এবং সত্যের পথ থেকে পিছু হননি। সমাজকে সকল প্রকার অশুভ, অন্ধবিশ্বাস, ভণ্ডামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে, সত্যের প্রচার প্রসার করেন। উনার তপস্যা, ধ্যান ও সত্য জ্ঞান সমাজকে একটি নতুন পথ দেখিয়েছে। মানুষ যদি প্রকৃত ঈশ্বরকে লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে মহর্ষি দয়ানন্দজীর পথ অনুসরণ করে উনার শিক্ষা ও জ্ঞানকে নিজের জীবনে ধারণ করতেই হবে। মহর্ষি দয়ানন্দজীর চরণে শত শত প্রণাম। এই হলো শিব রাত্রির পবিত্র বার্তা।

ডঃ বিবেক আর্য।

(লেখক, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সেন্টার ফর বেদিক স্টাডিজ এর প্রতিষ্ঠাতা)

অনুবাদকঃ শ্রী সোমনাথ ঘোষ



বাংলাদেশ অগ্নিবীর আয়োজিত অনলাইন শাস্ত্রশিক্ষা

“ স্বাধ্যায় ”

এর ৪র্থ ব্যাচের বিজয়ীগণ

1ST



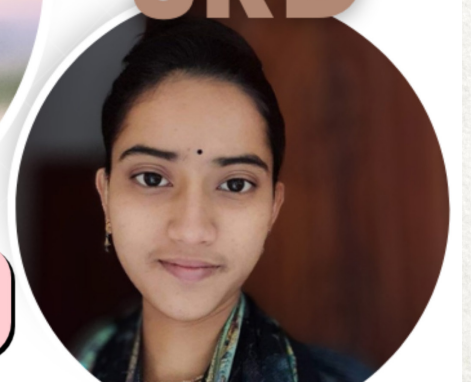
আশীষ মরকার

2ND



তন্ময় শর্মা

3RD



সংগীতা বিশ্বাস

বাংলাদেশ অগ্নিবীর পরিচালিত "স্বাধ্যায়" কোর্সের ৪র্থব্যাচের ফলাফল প্রকাশ

১ম স্থানঃ Ashish Sarker

২য় স্থানঃ তন্ময় শর্মা

৩য় স্থানঃ সংগীতা বিশ্বাস

বিজয়ীদের উপহার শীঘ্রই পৌঁছে দেওয়া হবে
সবাইকে বৈদিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

নমস্কার